মোগল রাজধানী ঢাকা

ড. আবদুল করিম

www.nagorikpathagar.org

মোগল রাজধানী ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মোগল রাজধানী ঢাকা

মূল
ড. আবদুল করিম

অনুবাদ
ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

বাএ ৪৩৯৭

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০১/জুন ১৯৯৪। পাণ্ডুলিপি : ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১০/সেপ্টেম্বর ২০০৩। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, উপপরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মোঃ হামিদুর রহমান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার। মুদ্রণসংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ৯০.০০ টাকা

MUGHAL RAJDHANI DHAKA [Bangla translation of Dr. Abdul Karim's Dacca the Mughal capital by Mohammad Mohibullah Siddiquee]. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint: September 2003. Price : Taka 90.00 only.

ISBN 984-07-4466-2

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার প্রথম জীবনের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

মওলানা শিহাবউদ্‌দীন আহমদ ছিদ্দিকী

মাস্টার আবদুল করিম এবং

মওলানা মুনির আহমদ সাহেবদের করকমলে

যাঁদের কাছে আমি বর্ণমালা শিখেছি।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের কথা

'ঢাকা দি মোগল ক্যাপিট্‌ল' গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ আবদুল করিম তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের যৌক্তিকতা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার পটভূমিই শুধু বর্ণনা করব। ১৯৮৮ সালে প্রফেসর করিম ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সিনিয়র ফেলো হিসেবে যোগদান করার পর আমি তাঁর সাথে দুই বছর একত্রে থাকার সুযোগ লাভ করি। এটা আমার জীবনের একটি বড় সৌভাগ্য। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষাভাষী ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য উক্ত গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার কথা বলেন। তাই আমি গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমার এ সিদ্ধান্তের পেছনে আরও দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, গ্রন্থটি ১৯৬৫ সালে ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুদ্রিত কপি নিঃশেষিত হওয়ায় দীর্ঘকাল যাবৎ গ্রন্থটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এর পুনঃপ্রকাশ আশু প্রয়োজন বলে মনে করছিলাম। দ্বিতীয়ত, ফার্সি যেরকম আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না তেমনি এমন দিনও হয়তো আসবে যেদিন ইংরেজিও আমাদের ছাত্রদের কাছে দুর্বোধ্য হবে। সে দিনটির কথা ভেবে আমি গ্রন্থটি অনুবাদের তাগিদ অনুভব করি।

অনুবাদ একটি কঠিন কাজ, বিশেষ করে ইতিহাসগ্রন্থের অনুবাদ। তা সত্ত্বেও গ্রন্থকারের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমার দ্বারা এ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থটি পাকিস্তান আমলে প্রণীত ও প্রকাশিত। তাই ঢাকার অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার পূর্ব পাকিস্তান কথাটি ব্যবহার করেছেন। অনুবাদ করার সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করেছি। গ্রন্থকার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃথক পৃথক ক্রমিক নাম্বার দিয়ে পাদটীকা লিখেছেন। অনুবাদের পরে আমি ধারাবাহিক ক্রমিক নাম্বার দিয়ে পাদটীকাসমূহ অধ্যায়ের শেষে সংযোজন করেছি। একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন টীকা লিখেছি। রুপীকে টাকায় অনুবাদ করেছি। কিন্তু আনা, পয়সা, পাই, সের, মণ ইত্যাদি হুবহু রেখেছি। আনা, পয়সা ইত্যাদিকে দশমিক পয়সায় এবং সের, মণ ইত্যাদিকে কিলোগ্রামে রূপান্তরিত করিনি। সহজে বোঝার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থে ৩৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী ১৩টি পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে। পরিশিষ্টসমূহ ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিসংখ্যান দ্বারা পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার বলেছেন, গবেষকদের নতুন নতুন গবেষণায় সহায়তা দানের জন্য তিনি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি হতে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। (P-VIII) বিশ বছর আগে প্রকাশিত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টসমূহের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

কিনা আমার জানা নেই। মূলগ্রন্থে পরিশিষ্টসমূহ সম্পর্কে বহুবার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার পরিশিষ্টসমূহ অনুবাদ করতে আমাকে বারণ করেছেন। এর পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সংগৃহীত দলিলদস্তাবেজগুলো গবেষণার জন্য একবার প্রকাশিত হয়েছে বিধায় এগুলোর পুনঃপ্রকাশ অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, এগুলো অনূদিত হলে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং এতে প্রকাশের ব্যয়ও অধিক হবে। ফলে গ্রন্থের দাম বেশি হবে এবং তা অনেক পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। সে যাই হোক, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য উদাহরণ হিসেবে পরিশিষ্ট-১ অর্থাৎ প্রথম পরিশিষ্টটি অনুবাদ করে গ্রন্থের শেষে সংযোজন করেছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদ কাজে প্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মিসেস কামরুন রহমানকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেবলমাত্র বন্ধুত্বের কারণে কষ্ট স্বীকার করে প্রেস-কপি পড়ে দেখার জন্য বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব অনীক মাহমুদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক সময় ও শ্রম দিয়ে প্রেস-কপি তৈরি করে আমার স্নেহের ছাত্র মাহ্মুদুন্নবী পিন্টু আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে পাণ্ডুলিপিটির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। গ্রন্থটি সত্বর প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলা একাডেমীর পরিচালক সুব্রত বড়ুয়া এবং উপপরিচালক জনাব ফরহাদ খানকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী
জুন ১৯৯৪

মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

মোগল রাজধানী ঢাকার বড় সৌভাগ্য হচ্ছে, এটি বহু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নবাব নসরত জঙ্গ, চার্লস ডয়লী, সৈয়দ আওলাদ হাসান, রহমান আলী তায়েশ, হাকীম হাবিবুর রহমান, এস. এম. তাইফুর এবং এ. এইচ. দানীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁরা সকলেই ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন স্থাপত্যসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কেউই মোগল রাজধানী ঢাকার উত্থান ও পতনের ইতিহাস বর্ণনা করেননি। মোগল প্রশাসনিক ইতিহাসে ঢাকার ভূমিকা কেউই উল্লেখ করেননি এবং যেসকল অর্থনৈতিক কারণ ঢাকা শহরের উত্থান ও পতনের জন্য দায়ী তাও কেউই আলোচনা করেননি। এ কারণেই ঢাকার উপর বহু গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও আরো একটি গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

১৯৬০–৬২ শিক্ষাবর্ষে লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (বর্তমান কমনওয়েলথ রিলেশানস অফিস) গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহকালে আমি বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ের অসংখ্য প্রশাসনিক দলিলপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করি। এসকল দলিলদস্তাবেজ বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি এত বড় একটি প্রকল্পে হাত দিতে পারিনি। তাই শুধুমাত্র ঢাকা জেলার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহে আমি আত্মনিয়োগ করি। এ কাজ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মোগল রাজধানী ঢাকার উত্থান ও পতনের নেপথ্যে যেসকল অর্থনৈতিক কারণ দায়ী সেগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই ঢাকা জেলার ইতিহাস প্রণয়ন স্থগিত রেখে আমি শুধুমাত্র মোগল রাজধানী ঢাকার উপর তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করি। এটা সুস্পষ্ট যে, এই গ্রন্থের সঙ্গে আমার সংগৃহীত দলিলপত্র প্রকাশ আগামী দিনের পণ্ডিতদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। বিশেষত ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যাঁদের প্রবেশের সুযোগ নেই (অর্থাৎ আমাদের দেশ থেকে যাঁদের লন্ডন যাওয়ার সুযোগ হবে না), তাঁরা এসকল দলিলদস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে নতুন কাজ করার এবং নতুনভাবে তা বিশ্লেষণ করার সুযোগ লাভ করবেন। এ সকল দলিলদস্তাবেজ এবং অন্যান্য সহায়ক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে কয়েকটি অধ্যায় প্রণয়ন করে মোগল রাজধানী ঢাকার উত্থান–পতনের ইতিহাস বিবৃত করা এবং সংযোজিত দলিলদস্তাবেজসমূহকে আরো বেশি বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রণীত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি লাভের পর প্রাথমিকভাবে মুহাম্মদ রেজা খান এবং রাজা সেতাব রায়ের মাধ্যমে দিউয়ানি প্রশাসন পরিচালনা করে। কিন্তু ১৭৭২ সালে কোম্পানি নিজে

www.nagorikpathagar.org

দিউয়ানি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেদিন হতে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন পর্যন্ত কোম্পানির কর্মকর্তারা সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিলেন মোগল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য । তাঁরা কালেক্টর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সকল রেভিনিউ ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দলিলপত্রসমূহ পর্যালোচনা করেন। এ সমস্ত দলিলপত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে নির্বাচিত কিছু দলিলপত্র এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সমস্ত দলিলপত্রে প্রাপ্ত তথ্য ১৭৬৫ সালের পূর্বে মোগল শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করবে এবং এরূপ ধারণা নিয়েই এসব দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মোগল শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসনের উত্তরণ পর্যায়ে প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে দলিলপত্রে গোপন পরিবর্তন ও জালিয়াতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সময়ে একই কারণে কর্মচারী পরিবর্তন ও বাণিজ্যের আয়তনের পরিবর্তনের কথাও মনে রাখতে হয়েছে। দলিলপত্রসমূহ প্রকাশকালে স্থানের নাম ও বাণিজ্যিক পণ্যের নামের আধুনিক বানান এবং সঠিক রূপ নির্দেশ করার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। আশা করা হয়েছিল যে, এসব হুবহু প্রকাশিত দলিলপত্র গবেষকদেরকে তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে।

যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশীপ এন্ড ফেলোশীপ প্লানের অধীনে ১৯৬০–৬২ শিক্ষাবর্ষে কমনওয়েলথ স্কলার হিসেবে লন্ডনে অবস্থানকালে আমি এ সকল দলিলপত্র সংগ্রহ করি এবং এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করি। আমাকে স্কলারশীপ প্রদানের জন্য আমি যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ কমিশনের নিকট কৃতজ্ঞ। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির যে সকল কর্মকর্তা–কর্মচারী এসব দলিলপত্র সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে উপস্থিত জটিল সমস্যাসমূহ সমাধানে আলোচনার মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্ট্যাডিজের বিজ্ঞ পণ্ডিত মেজর জে. বি. হ্যারিসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানকে, মুদ্রণ পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান ও প্রুফ সংশোধনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ এস. সাজ্জাদ হোসাইনকে, নির্ঘণ্ট তৈরির জন্য আমার ছাত্র ও সহকর্মী জনাব মহিউদ্দিন মাহমুদ হাফিজকে এবং গ্রন্থটির প্রকাশনা ত্বরান্বিত করার জন্য এশিয়াটিক প্রেসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — আবদুল করিম

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সাল

www.nagorikpathagar.org

শব্দসংক্ষেপ

আইন : আইন-ই-আকবরী, ভল্যুম-২, এইচ. এস. জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং জে. এন. সরকার কর্তৃক সংশোধিত।

বাহারিস্তান : বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, মীর্জা নাথন প্রণীত এবং এস. আই বোরাহ্ কর্তৃক অনূদিত।

B. P. C. (Bengal Public Consultation : Diary and Consultation of the English Council in Calcutta, the India Office Library.

B.P.P. : Bengal Past and Present.

Fifth Report : The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, 1812, ডব্লিউ. কে. ফারমিঙ্গার সম্পাদিত।

H. C .: History of Bengal, ভল্যুম-২ জে. এন. সরকার সম্পাদিত।

P. C. C. : Proceedings of the Committee of Circuit at Dacca, ভল্যুম-৪।

রিয়াজ : রিয়াজ-উস-সালাতিন, গোলাম হুসেন সেলিম প্রণীত।

তারিখ : তাওয়ারীখ-ই-বাংগালা, সলিমুল্লাহ্ প্রণীত।

Topography : জেমস টেলর প্রণীত A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca.

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	ঢাকার নামকরণ	১–৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ঢাকার নবাবগণ	৭–২১
তৃতীয় অধ্যায়	:	ঢাকা শহরের বিকাশ	২২–৩৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	প্রশাসনিক সদর দফতর হিসেবে ঢাকা	৪০–৫৪
পঞ্চম অধ্যায়	:	ব্যবসা–বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা	৫৫–৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	ঢাকার অর্থনৈতিক জীবন	৭২–৮৬
পরিশিষ্ট–১	:	ঢাকার হাট, বাজার ও গঞ্জসমূহ থেকে গৃহীত অর্থের হিসাব	৮৭–৯০
গ্রন্থপঞ্জি	:		৯১–৯৫

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ঢাকার নামকরণ

আজকের দিনে 'ঢাকা' বলতে বাংলাদেশের একটি জেলা এবং তার সদর দফতরকে বোঝায়। বাংলাদেশের রাজধানীও ঢাকা। ঢাকা জেলার বর্তমান নাম ও অবয়ব দুটোই ব্রিটিশদের সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক এককগুলোর বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় *আইন-ই-আকবরী* নামক গ্রন্থে। এই তালিকা অনুসারে বাংলা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি সরকার বহু মহাল বা পরগনায় বিভক্ত ছিল। *আইন-ই-আকবরীতে* বর্ণিত দুটি সরকার হচ্ছে সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁও।[১] *আইন-ই-আকবরী* রচিত হওয়ার পরে এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে প্রশাসনিক একক হিসেবে বিদ্যমান ছিল এই সরকারগুলো। কিন্তু ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খান (যিনি ১৭২৭ সালের জুন পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাকে ১৯টি সরকারের স্থলে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন।[২] মুর্শিদকুলী খানের এই পুনর্বিন্যাসে মোটামুটি চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের অন্তর্ভুক্ত হয় বাজুহা, সোনারগাঁও, বাকলা ও ফতাহাবাদ সরকার এবং মাহমুদাবাদ ও ঘোরঘাটের পূর্বাংশ।[৩] ১৭৬৫ সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করে, তখন চাকলা পদ্ধতির প্রশাসন ব্যবস্থা তারা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। ১৭৭২ সালে কমিটি অব সার্কিট মেঘনা নদীর পূর্ব তীরের পরগনাসমূহ (এবং চট্টগ্রাম অথবা চাকলা ইসলাম বাদের পশ্চিমাংশ) নিয়ে লক্ষ্মীপুর নামক একটি পৃথক কালেক্টরেট গঠন করে।[৪] এই পৃথক কালেক্টরেট গঠন করা হয়েছিল রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং এই নতুন কালেক্টরেটকে ১৭৭৩ সালে গঠিত ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে সিলেটকেও (চাকলা সিলেট) ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের অধীনে ন্যস্ত করা হয়, যদিও সিলেট একটি পৃথক কালেক্টরেট ছিল।[৫] ১৭৮১ সালে ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত হওয়ার পরে উক্ত কালেক্টরেটগুলো রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিষয়ে ঢাকা থেকে পৃথক হয়ে যায়। ১৮৮৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুরকে ঢাকা থেকে পৃথক করা হয়। ১৮৭১ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফতগঞ্জ থানা এবং ঢাকার মানিকগঞ্জের বিনিময়ের মাধ্যমে ঢাকা জেলার সীমানা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে জেলার সীমানার যে ছোটখাটো পরিবর্তন হয় তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৬]

জেলা হিসেবে ঢাকার সৃষ্টি ব্রিটিশ আমলে হলেও ঢাকা শহরের ইতিহাস মোগল আমলের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮–১৬১৩) ঢাকাকে শুধু মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুবা বাংলার রাজধানীই করেননি, বরং মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর।[৭]

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত একটি কিংবদন্তি মতে, এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃশ্যমান ঢাক গাছ (Butca Frondosa) থেকে ঢাকা নামের উদ্ভব হয়েছে।[৮] আরেকটি কিংবদন্তি মতে, এখানে হিন্দু দেবী দুর্গা লুক্কায়িত হয়ে যান (বাংলা শব্দ ঢাকা অর্থ লুক্কায়িত)। এ কারণে এ এলাকার নাম হয়েছে ঢাকা।[৯] প্রচলিত তৃতীয় অভিমত হচ্ছে, যখন সুবাদার ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন তিনি এ এলাকার কেন্দ্রে ঢাক বাজিয়ে যতদূর পর্যন্ত ঢাকের শব্দ শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত তাঁর রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ করেন এবং এই ঢাক বাজানো থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়।[১০] কতিপয় আধুনিক লেখক ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, 'রাজতরঙ্গিনী'তে ব্যবহৃত 'ঢাককা' অর্থাৎ পাহারা –চৌকি থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ প্রাচীনকালে পূর্ববাংলার নিম্নাঞ্চলের মধ্যে ঢাকা উচ্চভূমি ছিল এবং তা প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুর এবং সোনারগাঁও–এর পাহারা –চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এসকল লেখক তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে আরেকটি অতিরিক্ত যুক্তি খুঁজে পান প্রাকৃত ভাষায় প্রচলিত 'ঢাকা ভাষা' নামের মধ্যে।[১১] এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হলো, ঢাকা সোনারগাঁও অথবা বিক্রমপুরের পাহারা–চৌকি ছিল বলা মুশকিল ; কারণ প্রাক মোগল যুগে এই স্থানের অবস্থান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আজকের ঢাকা প্রাচীনকালে আদৌ উচ্চভূমি ছিল কিনা আমরা জানি না। এতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এখন অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীনকালে গঙ্গা নদী (আজকের পদ্মা) বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো।[১২]

ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণের পরেও ঢাকা নামটি জনপ্রিয় থেকে যায়। মির্জা নাথন তাঁর রচিত *বাহারিস্তান–ই–গায়বী* গ্রন্থে উভয় নাম পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। যেমন ঢাকা ওরফে জাহাঙ্গীরনগর অথবা জাহাঙ্গীরনগর ওরফে ঢাকা। পরবর্তীকালে ফার্সি ভাষায় রচিত কালানুক্রমিক ঘঠনাপঞ্জি এবং মোগল দাপ্তরিক রেকর্ড থেকে যতদূর জানা যায়, মোগলরা জাহাঙ্গীরনগর নামই ব্যবহার করতো। কিন্তু মোগল প্রশাসনিক পরিমণ্ডলের বাইরে সাধারণ মানুষ ঢাকা নামই ব্যবহার করতো। এমন কি, সকল বিদেশী পরিব্রাজক এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীবর্গও তাঁদের দাপ্তরিক কাগজপত্রে ঢাকা নামই ব্যবহার করতেন।[১৩]

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ২৬ মাইল দীর্ঘ এ নদীটি সাভারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী থেকে নির্গত হয়ে নারায়ণগঞ্জের কিছু উত্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী এবং তার জন্মস্থল ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে ঢাকা জলপথে বৃহৎ নদীসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত।

বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নদীর গতিপরিবর্তন। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যখন ইসলাম খান ঢাকায় তাঁর স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন এবং ঢাকা একটি রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করে, তখন সম্ভবত পূর্ববাংলার নদীগুলোর অবস্থান আজকের চাইতে ভিন্ন ছিল। এন. কে. ভট্টশালী দেখিয়েছেন যে, ফতুল্লা (প্রাচীনকালের ধাপা) থেকে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে প্রবহমান বুড়িগঙ্গার যে ধারা ধলেশ্বরী নদীর সাথে যুক্ত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, প্রাথমিক মোগল যুগে এবং প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতকে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[১৪] তখনকার দিনে বুড়িগঙ্গা বর্তমান নামে পরিচিত ছিল কিনা বলা খুবই কঠিন। কারণ *বাহারিস্তান-ই-গায়বীর* লেখক মির্জা নাথন বুড়িগঙ্গাকে দোলাই নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ দুটি নদীর সংযোগস্থলের অস্তিত্ব পরে বিদ্যমান না থাকলেও বুড়িগঙ্গা নদীর পরবর্তী গতিপ্রবাহ তার স্বাক্ষর বহন করে, যেখানে তা দুটি শাখা দ্বারা লক্ষ্যা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এ দুটি শাখায় তা বিভক্ত হয়েছে ঢাকার পূর্ব প্রান্ত ছাড়িয়ে। প্রধান শাখাটি খিজিরপুরের নিকটে এবং অন্য শাখাটি চার মাইল উজানে ডেমরার নিকটে লক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[১৫] বুড়িগঙ্গা ও লক্ষ্যার মিলিত ধারা ধলেশ্বরী ও ইছামতির মাধ্যমে মেঘনার সাথে মিলিত হওয়ার কারণে জলপথে ঢাকার সাথে মেঘনার উভয় তীরের জেলাসমূহের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রহ্মপুত্র প্রাচীনকালের মতো পুরনো গতিপথে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয় এবং তাই ঢাকা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার্শ্ব বরাবর উত্তর দিকে আসাম এবং রংপুর ও দিনাজপুরের মতো উত্তর বাংলার জেলাগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকের বর্তমান প্রবাহ (যমুনা) ছিল খুবই ক্ষীণ। এমন কি রেনেলের সময়েও এটি ছিল একটি ছোট খাল, যা সম্ভবত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যেত ।[১৬] কিন্তু এর অভাব পূরণ করতো করতোয়া ও আত্রাই নদী পদ্মা ও ইছামতি (ঢাকা জেলায়) নদীতে পতিত হয়ে। এভাবে উত্তর বঙ্গের উচ্চাঞ্চলের সাথে নিম্নাঞ্চলের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।[১৭] আবার দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে ডান দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতএব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা নদী খালবেষ্টিত কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল এবং ফলে নৌপথে ঢাকা বাংলার বহু জেলা এবং বাংলার বাইরেও মোগলদের অনেক প্রশাসনিক সদরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

ঢাকা শহরে নদী-খালের অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থান এবং মৃত্তিকার গঠন বিবেচনা করলে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলাকে দুই ভাগে অর্থাৎ উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে বিভক্ত করেছে। দক্ষিণাংশ নিম্নাঞ্চল, যা প্রায় ছয় মাস জলমগ্ন থাকে এবং উত্তরাংশ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত লক্ষ্যা নদীর দ্বারা প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মাঝখানে অবস্থিত উত্তরাংশের পূর্বভাগও বছরে প্রায় ছয় মাস প্লাবিত থাকে। দক্ষিণাংশ এবং উত্তরাংশের পূর্বভাগের বৃহদাংশই পলিমাটি দ্বারা গঠিত। কিন্তু উত্তরাংশের পশ্চিম ভাগের মাটির গঠন ভিন্ন রকম। এ অঞ্চল চারদিকের নদী সমতল থেকে উঁচু এবং প্লাবনমুক্ত। ঢাকা জেলার এই প্লাবনমুক্ত এলাকায় ঢাকা শহরের অবস্থান। এই উচ্চভূমি উত্তর দিকের উচ্চভূমির সঙ্গে সংযুক্ত, যা লাল মাটি দ্বারা গঠিত। এই উচ্চভূমি অতীতে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত পাণ্ডু নদী দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত ছিল।

এন. কে. ভট্টশালীর কৃতিত্ব এই যে, তিনি পঁচিশ বছর আগে (আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে) ঢাকা শহরের নদী-খালের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮] প্রকৃতপক্ষে নদীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঢাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ হচ্ছে দোলাই খাল, যার উপরে ভাসমান লৌহসেতু দ্বারা ফরাশগঞ্জ (মূলত ফ্রেন্সগঞ্জ) ও গেন্ডরিয়াকে

www.nagorikpathagar.org

সংযুক্ত করা হয়েছে। এই খাল দেখতে প্রাকৃতিক খালের মতো এবং এন. কে. ভট্টশালী মনে করতেন যে, সুদূর অতীতে বালু নদীর নিচের ধারা দোলাই খাল দিয়ে প্রবাহিত হতো। বালু নদী কাপাসিয়ার নিকটে লক্ষ্যা নদী থেকে নির্গত হয়ে ডেমরার অদূরে পুনরায় লক্ষ্যা নদীতে পতিত হয়েছে। দোলাই ডেমরা থেকে একটু উজানে বালু নদী থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা শহরের মধ্য দিয়ে আধুনিক মিল ব্যারাক এলাকার পার্শ্বে (মির্জা নাথনের মতে দোলাই-এর একটি শাখা) বুড়িগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু বালু নদী থেকে নির্গমস্থলের সামান্য দক্ষিণে দোলাই নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে—একটি শাখা উত্তর দিকে চলে গেছে এবং অন্য শাখা বর্তমান ঢাকার শাহবাগ হোটেলের উত্তর পাশে ঢাকা-তেজগাঁও সড়ক অতিক্রম করে সরাসরি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এখানেই নদীর উপর নির্মিত আম্বর সেতু শাহবাগ এলাকা ও কাওরানবাজার এলাকাকে সংযুক্ত করেছে।[২০] এই নদীর নাম পাণ্ডু নদী। রেনেল একে নেরিখাল বলে উল্লেখ করেছেন এবং লোকমুখে শোনা যায়, এ নদীর নাম কাওরান নদী।[২১] আজকের মিরপুর সড়কের কাছাকাছি কোথাও তার স্রোতধারা হারিয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে তুরাগ নদীমুখে তার স্রোতধারার চিহ্ন আজো বিদ্যমান। রেনেলের মানচিত্রে দোলাই থেকে তুরাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ খালটি দেখা যায় না। কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ নদীর দুটি স্রোতধারা এককালে সংযুক্ত ছিল এবং একটা পূর্ণাঙ্গ নদীর রূপ নিয়েছিল। খুব সম্ভবত ঢাকা শহরের সম্প্রসারণ পর্যায়ের নির্মাণ কর্মকাণ্ডের ফলে সংযোগ খালটির মধ্যভাগ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে। পাণ্ডু নদী ঢাকা শহরের জন্য অসামান্য কৌশলগত গুরুত্ব বহন করতো। ভট্টশালীর মতে পাণ্ডু নদীর দুটি শাখা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে দোলাই নদীতে পতিত হয়েছে। একটি শাখা আজকের রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পূর্ব পাশ দিয়ে প্রাচীন কায়সারবাগের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে দোলাই নদীতে পতিত হয়েছে। অপর শাখাটির উজানের দিকের অংশ শহরের প্রসারের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে এবং কেবল ভাটির দিকের অংশ এখন শনাক্ত করা যায়। বর্তমান নাজিমুদ্দিন রোড ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের মধ্যবর্তী রেলক্রসিংস্থলে এ নদীর উজানের অংশের চিহ্ন এখনো শনাক্ত করা যায়, যা পূর্ব পাকিস্তান যক্ষ্মা ক্লিনিকের ভবন নির্মাণের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেছে। শাখা দুটি কায়েতটুলীতে সংযুক্ত হয়ে বংশাল রোডের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং পশ্চিম প্রান্তে এসে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে এবং অতঃপর এর একটি শাখা আরমানিটোলার দিকে অগ্রসর হয়ে একটি জলাশয় সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে মালীটোলার দক্ষিণ প্রান্তে এসে পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে প্রাচীন রায় সাহেব বাজার এবং নারিন্দা (মূলত নারায়নদীয়া) সেতু অতিক্রম করে দোলাই নদীতে পতিত হয়েছে। এই শাখা নদীটি ঢাকা শহরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে এই নদীর সকল গুরুত্বপূর্ণ পারাপারস্থলে সরকারি খরচে অথবা ব্যক্তিবিশেষদের প্রদত্ত অর্থে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত সেতুর মধ্যে চান্দখাঁর পুল ও রাজার পুল উল্লেখযোগ্য।[২৩]

নদীমাতৃক বাংলা, বিশেষত পূর্ব বাংলা নদী-উপনদীতে পরিপূর্ণ এবং পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকা বছরের অর্ধেক সময় প্লাবিত থাকে। কাজেই এদেশের নৌশক্তি ও বাণিজ্য উভয়ই নৌকা ও জলপথের উপর নির্ভরশীল। দেশীয় জমিদার ও ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

মোগলদের প্রেরিত অভিযানে নৌবহর ও জলপথের গুরুত্ব *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ঢাকা জেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঢাকা শহরের নদ-নদী সম্পর্কে উপরের আলোচনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঢাকার অবস্থান কৌশলগত ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সর্বোত্তম ছিল এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক ছিল। এসব কারণে ইসলাম খান চিশতী রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

ঢাকাকে একবার রাজধানীতে পরিণত করার পরে দেখা যায় যে, রাজধানী হিসেবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। দেশের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ঢাকা গড়ে ওঠে। বেশ কিছু কাল যাবৎ সমগ্র প্রদেশের, বিশেষত পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হতো ঢাকা থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী ও বণিক এখানে এসেছে। এসেছে পাঠান, মোগল ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীগণ। সবশেষে এসেছে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো। ঢাকার মসলিনের ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এদেশের কৃষিজাত দ্রব্য উপমহাদেশের অন্যান্য প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হতো। কাজেই এই শহরের প্রসার, ক্রমবিকাশ এবং দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতিতে এর ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা আজ একান্ত প্রয়োজন।

ঢাকা সম্বন্ধে বিদগ্ধ ও খ্যাতনামা পণ্ডিতদের রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থে প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এখানকার স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষগুলোর উপর এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু যুগান্তকারী ঘটনার উপর। কিন্তু যেসব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এখানে সক্রিয় ছিল সেগুলো এতে উপেক্ষিত হয়েছে এবং আজো অনালোচিত রয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে মূলত এ শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর মোগল আমল সম্পর্কে আলোচনাতেই এ রচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই এ গ্রন্থের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'মোগল রাজধানী ঢাকা'।

টীকা

১. *আইন* পৃ. ১৫০-১৫২ ; জন বিমস্ *Journal of the Royal Asiatic Society* তে সরকারসমূহের সীমানা আলোচনা করেছেন, পৃ. ৮৩-১৩৫।

২. *Fifth Report,* পৃ. ১৮৯-১৯১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

৪. *P.C.C.,* পৃ. ১৬১-১৬৪।

৫. এখানে উল্লেখ্য যে ব্রিটেশ যুগের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল এবং মোগল যুগের ক্রান্তিলগ্নে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নিয়াবতের সীমানা মোটামুটি একই ছিল। ঢাকা নিয়াবত সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এফ.ডি. এসকলী, *Final Report of the Survey and settlement of Dacca.* পৃ. ১-৩।

www.nagorikpathagar.org

৭. *H.B.*, পৃ. ২৭০।

৮. *Topography*, পৃ. ৯১। এখন ঢাক গাছ আর দেখতে পাওয়া যায় না।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬ এবং ৩৫১।

১০. কে.বি. সৈয়দ আওলাদ হাসান, *Notes on the Antiquities of Dacca*, পৃ. ১-২।

১১. ডি.সি. সরকার, *ভারতীয় বিদ্যা*, একাদশ খন্ড তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ; এ ইমাম, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, ভল্যুম-৩, ১৯৫৮, পৃ. ১৯৯-২০১ ; যতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, ভল্যুম-২, পৃ. ৩৭-৩৮।

১২. *History of Bengal*, ভল্যুম-১, পৃ.৪।

১৩. তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন, *The Diary of Willam Hedges*, ভল্যুম-১, পৃ. ৩৭ ও ৪২।

১৪. *B.P.P.* ভল্যুম-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৫১।

১৫. *বাহরিস্তান*, পৃ. ৭৬।

১৬. রেনেলের মানচিত্র, সীট নং-৬।

১৭. ইসলাম খান এবং মোগল নৌবাহিনী এ পথে ঢাকায় আসেন। দেখুন, *বাহারিস্তান*, পৃ. ৪৫।

১৮. *B.P.P*, ভল্যুম-৩৩, ১৯২৭, পৃ. ২৭-২৯।

১৯. বতর্মানে সড়ক প্রসারিত করতে গিয় সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

২০. রেনেলের মানচিত্র, সীট নং ১২।

২১. সম্ভবত মুসলিম শাসনকালে পাণ্ডু নদীর নাম কাওরান নদী করা হয়েছে।

২২. *B.P.P*, ভল্যুম-৩৩, ১৯২৭, পৃ. ২৮

২৩. এই শহরের নদী-খালের অবস্থান পর্যালোচনা করে আমি ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদানের তাগিদ অনুভব করেছি। নদীর মাঝে দ্বীপ ভেসে উঠার দৃশ্য যিনি দেখেছেন, এ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে তিনি সক্ষম হবেন। সম্ভবত ভূভাগটি একবার ভেসে উঠেছিল এবং তার দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো কালে কিছু সময়ের জন্য তা পুনরায় পানির নিচে চলে যায়। ফলে তার নাম হয় ঢাকা (বাংলা শব্দ ঢাকা অর্থ হচ্ছে আবৃত বা লুক্কায়িত)।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকার নবাবগণ

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলাম খান চিশতী মোগল সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং ক্ষমতাসীন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫–১৬২৭) নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। এর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ রাজধানী হিসেবে ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে শাহ সুজার সুবাদারি আমলে (১৬৩৯–১৬৫৮) এর কিছু ব্যত্যয় ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে মোগল শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত ঢাকা তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত নায়েব–নাযিমের শাসনকেন্দ্র ছিল। পূর্বেকার ঐতিহাসিকবৃন্দ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলার সুবাদারদের শাসনকালের ঘটনাপঞ্জি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তার পটভূমিকা হিসেবে বর্তমান অধ্যায়ে পূর্বেকার ইতিবৃত্ত, বিশেষত হিস্ট্রি অব বেঙ্গল–এর দ্বিতীয় খণ্ড সামনে রেখে এর ভিত্তিতে বাংলার সুবাদারদের আমলের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি আলোচনা করা হয়েছে এবং ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের তারিখ ও কারণ নির্ধারণের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে উদ্ভূত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এসব বিষয় আরো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নায়েব–নাযিমদের আমলের ঘটনাবলী, যেগুলো আজ পর্যন্ত রহস্যাবৃত রয়েছে, সেগুলো এই অধ্যায়ে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর

বাংলার মোগল রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের তারিখ ও কারণ সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতগণ অভিন্ন মত প্রকাশ করেননি। চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮৯৩ সালে বলেন যে, বাংলার ভাটি অঞ্চলে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমনের প্রয়োজনে রাজমহল থেকে ঢাকায় (পূর্ব বাংলায়) রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।[১] অতঃপর এস. এন. ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বাংলায় মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন এবং বিদ্রোহী জমিদার ও সামন্ত প্রধানদের প্রতিহত করার জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।[২] মির্জা নাথন *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* গ্রন্থে মুসা খান ও উসমান খানের মতো বিদ্রোহী সামন্ত প্রধানকে দমনের কথা বলেছেন।[৩] কিন্তু মগ ও পর্তুগীজদের কথা তিনি কিছুই বলেননি। অতএব মনে হয়, ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল বিদ্রোহী জমিদার ও সামন্ত প্রধানদের দমন। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের তারিখ সম্পর্কে এস. এন. ভট্টাচার্য বলেন যে, বাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খানের নিয়োগ এবং ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, ইকবালনামা* এবং আবদুল লতিফের রোজনামচার ভিত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন যে, ১৬০৮ সালে (এপ্রিল-মে মাসে) বর্ষা শুরুর দিকে ইসলাম খান সুবাদার হিসেবে নিয়োগলাভ করেন এবং আনুমানিক ১৬১০ সালের মাঝামাঝি দিকে তিনি ঢাকায় পৌছেন। রাজধানী স্থানান্তর সম্পর্কে তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, রাজধানী স্থানান্তর কোনো পরিকল্পনার ফল নয় এবং এ স্থানান্তর প্রক্রিয়াও একই সময়ে সম্পন্ন হয়নি ; বরং এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ইসলাম খানের ঢাকায় দীর্ঘকাল অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বাংলার অস্থায়ী সামরিক ছাউনিকে একটি স্থায়ী জনপ্রশাসনকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার মর্যাদা সম্পর্কে এস. এন. ভট্টাচার্য বলেন যে, ইসলাম খানের ঢাকায় প্রবেশের পর পরই অনানুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর ; কিন্তু উসমান খান আফগানের পরাজয়ের পর সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে রাজমহলের স্থলে ঢাকা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।[৪] এ বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করেন এন. কে. ভট্টশালী ও এম. আই. বোরাহ। বিচ্ছিন্নভাবে রাজধানী স্থানান্তর এবং তার পুনঃনামকরণের ব্যাপারে ভট্টশালী এস. এন. ভট্টাচার্যের সাথে একমত পোষণ করেন বলে মনে হয়। কিন্তু বোরাহ মনে করেন যে, ইসলাম খানের ঢাকায় প্রবেশের সাথে সাথে ঢাকা রাজধানীতে পরিণত হয়।[৬] রাজধানী স্থানান্তরের তারিখ প্রসঙ্গে ভট্টশালী ও বোরাহ উভয়েই ভিন্নমত পোষণ করেন। *বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে* বর্ণিত তারিখ অনুসারে তাঁরা বলেন যে, ১৬০৭ সালে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগলাভ করেন এবং তিনি ১৬০৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা পৌছেন। পরবর্তীকালের লেখকগণও সাধারণভাবে এ ধারণাই পোষণ করেন।

এস. এন. ভট্টাচার্য এ বিষয় পরবর্তীকালে নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী ধারণার সপক্ষে কিছু যুক্তি সংযোগ করতে সক্ষম হন। *বাহারিস্তানে* বর্ণিত অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তিনি প্রতিপাদন করেন যে, মির্জা নাথনের প্রদত্ত তারিখ নির্ভরযোগ্য নয়। মির্জা নাথনের বর্ণনামতে, ইসলাম খান সুবাদার হিসেবে নিয়োগলাভের পর ঢাকা পৌছার পূর্বে দুটি বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। তিনি প্রথম বর্ষাকাল রাজমহলে এবং পরবর্তী বর্ষাকাল উত্তর বঙ্গে (ঢাকা অভিমুখে যাত্রাপথে ঘোড়াঘাটে) অবস্থান করেন।[৯] কিন্তু তারিখ লিপিবদ্ধ করার সময় মির্জা নাথন দুই বছরের পরিবর্তে একবছর সময় নির্দেশ করেন। বাহারিস্তানে দুটি তারিখ পাওয়া যায়। প্রথম তারিখ হচ্ছে ৫ই রবিউল আওয়াল, ১০১৬ হিজরী (৩০শে জুন, ১৬০৭), যেদিন সম্রাট জাহাঙ্গীর মির্জা নাথনের পিতা ইহতিমাম খানকে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছিলেন ; দ্বিতীয় তারিখ হচ্ছে ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১০১৭ হিজরী (১১ই জুলাই, ১৬০৮), যেদিন ইসলাম খান ঢাকা শহরের কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থান করছিলেন, যেখান থেকে ঢাকা পৌছতে তাঁর প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল।[১০] পরবর্তী যে তারিখটি ভট্টশালী গ্রহণ করেন, তা খোদ মির্জা নাথনের বর্ণনার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঢাকা পৌছার পূর্বে ইসলাম খান দুটি বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। সুতরাং এস. এন. ভট্টাচার্য সঠিকভাবেই *বাহারিস্তানে* উল্লিখিত তারিখ বাতিল করেন এবং তাঁর পূর্বের মতের উপর পুনরায় জোর দেন। ইসলাম খানকে সুবাদার হিসেবে নিয়োগের তারিখ সম্পর্কে তিনি *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে* বর্ণিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিমত প্রদান করেন। *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী* থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইসলাম খান বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগলাভ

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন ১৬০৮ সালে (১৬০৭ সালে নয়)। *তুজুকের* বিবরণ গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বাহরিস্তানে বর্ণিত তারিখের চেয়ে *তুজুকে* বর্ণিত তারিখ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। উভয় গ্রন্থই দিনলিপি আকারে রচিত। কিন্তু *তুজুকের* কালক্রম আলোচ্য বিষয়ের সাথে আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ। এতে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ, তাঁর প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহ, লাহোর পর্যন্ত খসরুর পশ্চাদানুসরণ, লাহোর থেকে কাবুল পর্যন্ত পরিদর্শন, কাবুল থেকে লাহোর এবং তারপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে সতর্কভাবে ঘটনার সময়কাল নির্ধারণ করতে গেলে দ্বিধা-সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়ত জাহাঙ্গীর সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি যখন লাহোরে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি জাহাঙ্গীর কুলীর মৃত্যুসংবাদ পান এবং এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিহারের সুবাদার ইসলাম খানকে বাংলায় নিযুক্তির আদেশ দেন।[১১] যদি খসরুর পশ্চাদানুসরণকালে তিনি লাহোরে সংবাদটি শুনতেন, তাহলে তার তারিখ হতো ১৬০৭ সাল। কিন্তু আসলে তা নয়, তিনি কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই উক্ত সংবাদ পান। কারণ এরপরই তিনি মীর বহর (এডমিরাল) ইহতিমাম খানকে দিল্লী হতে ছুটি প্রদান করেন। আর তিনি তাঁকে নিয়োগদান করেছিলেন ইসলাম খানেরই অনুরোধে এবং খোদ ইসলাম খানের নিযুক্তির পর। এ ঘটনাটি বাহারিস্তানেও উল্লিখিত আছে।[১২] তাই *তুজুকে* বর্ণিত তারিখসমূহ সতর্কভাবে পরীক্ষা করার পর *তুজুক* ও *বাহারিস্তান* উভয়ে বর্ণিত ঘটনাবলীর আলোকে পর্যালোচনা করলে নিম্নরূপ কালক্রম সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

বিহারের সুবাদার থাকাকালে ১৬০৮ সালে (সম্ভবত মে মাসে) ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগদান করা হয়। ইসলাম খান সত্বর তৎকালীন বাংলার রাজধানী রাজমহলে চলে আসেন এবং সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কিছু নতুন অফিসার নিয়োগ এবং কিছু পুরাতন অফিসারকে বরখাস্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সম্রাটের নিকট পত্র লিখেন। সম্রাট ইহতিমাম খানকে রাজকীয় নৌবহরের এডমিরাল হিসেবে নিয়োগদান করেন এবং ১৬০৮ সালে সম্ভবত জুন মাসে তাঁকে দিল্লীত্যাগের নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে ইহতিমাম খান এলাহাবাদ হয়ে রাজমহল পৌছেন। পথিমধ্যে রোটাস দুর্গে গিয়ে ফিরে আসতে তাঁর কিছু সময় চলে যায়। ১৬০৮ সালের বর্ষাকাল তখন শেষ হয়ে গেছে।[১৩] ইসলাম খান দিউয়ান, বখশি, এডমিরাল এবং সংস্থাপন বিভাগের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গৌড় হয়ে পূর্ববাংলার দিকে অগ্রসর হন। উত্তর বঙ্গের ঘোড়াঘাটের নিকটে ১৬০৯ সালের বর্ষাকালে কাটিয়ে তিনি পরবর্তী বছর বর্ষার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৬১০ সালের জুলাই মাসের দিকে ঢাকা পৌছেন।

রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে এস. এন. ভট্টাচার্য ও ভট্টশালী উভয়ের ধারণা অস্পষ্ট ছিল বলে মনে হয়। কারণ রাজধানী বিচ্ছিন্নভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং একটি অস্থায়ী সেনাছাউনিকে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী জনপ্রশাসনকেন্দ্রে পরিণত করা হয় বলে তাঁদের ধারণার পক্ষে তেমন কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। বাহারিস্তান থেকে জানা যায় যে, রাজমহল থেকে ইসলাম খানের যাত্রাকালে বাংলার সমগ্র সামরিক প্রশাসন ও সংস্থাপনের সকল লোকজন সুবাদারের সাথেই যাত্রা করে। বখশি ও দিউয়ান পেশাগত কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যাদিসহ সুবাদারের সাথে যাত্রা করে। যাত্রাকালে ইসলাম খান কিছু জায়গীর পূনর্বণ্টনের আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং দিউয়ান তা কার্যকরী করেছিলেন। মির্জা নাথন

www.nagorikpathagar.org

সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, যখন ইসলাম খান ঢাকা প্রবেশ করেন তখন দিউয়ান এবং বখ্‌শিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[১৪] দ্বিতীয়ত মির্জা নাথন অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় একথাও বলেন যে, যাত্রার সময় ইসলাম খান বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের নিকট পৌঁছলে তিনজন রাজকীয় কর্মকর্তাকে প্রচুর সৈন্য, নৌকা ও অধস্তন কর্মচারীসহ ঢাকায় দুর্গ নির্মাণ অথবা মেরামতের জন্য প্রেরণ করেন। তৃতীয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, মির্জা নাথন এই স্থানকে ইসলাম খানের প্রবেশের পূর্বেই ঢাকা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু ইসলাম খানের প্রবেশের পর তিনি একই স্থানকে জাহাঙ্গীরনগর, নামান্তরে ঢাকা বলে উল্লেখ করেন। জাহাঙ্গীর *তুজুকে* প্রথমে ইসলাম খানের আবাসস্থল এই স্থানকে ঢাকা বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু পরে ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর নাম ব্যবহার করেন।[১৬] পরবর্তীকালের গ্রন্থসমূহে শুধু জাহাঙ্গীরনগর নাম পাওয়া যায়।[১৭] অতএব এক্ষেত্রে এস. এন. ভট্টাচার্যের অভিমতের পক্ষে তেমন কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং একথা বলা যায় যে, ঢাকায় ইসলাম খানের প্রবেশের পর অথবা এখানে তাঁর বাসস্থান স্থাপনের পর ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করা হয়। একই সময়ে এর নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করা হয়। যেহেতু সুবাদার এবং বখশি ও দিউয়ানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ সমগ্র সংস্থাপন দপ্তরসহ যুগপৎভাবে ঢাকায় প্রবেশ করেছিল, তাই একই সময়ে সমগ্র সরকারি সংস্থাপনা স্থানান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে দু'একটা অধস্তন বিভাগ স্থানান্তর অথবা স্থাপন রাজধানী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কোনো মুখ্য ব্যাপার নয়। এতে তথ্যের কোনো হেরফের হয় না।

পরবর্তী শতাব্দীতে ঢাকার অবস্থান

১৬১০ সালে বাংলার রাজধানীতে পরিণত হওয়ার পর ঢাকার মর্যাদা পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। এই সময়ে প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। এখানে বিদ্যমান ছিল সুবাদারের বাসস্থান এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যালয়। এই সময়কালের মধ্যে শাহজাদা শাহ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে একান্ত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই ব্যবস্থা মাত্র বিশ বছর অর্থাৎ ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। এই সময়ে তাঁর সাথে সুবাদারি সংস্থাপনাও স্থানান্তরিত হয় এবং ঢাকা পুনরায় সংকুচিত হয়ে একটি অধস্তন বিভাগীয় দপ্তরে পরিণত হয়।[১৮] কিন্তু আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের পর শাহ সুজা আরাকানে পালিয়ে গেলে পরবর্তী নতুন সুবাদার মীর জুমলা পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে শাহজাদা আযম শাহের সুবাদারিকাল (১৬৭৮-১৬৭৯) পর্যন্ত ঢাকা রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সুদৃঢ় অবস্থান থেকেই মীর জুমলা কুচ, হাজো এবং আসামের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শায়েস্তা খান মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন। এই ঢাকাতেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ এবং পাঠান, মোগল ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরা ভিড় জমিয়েছিল। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম-২[১৯]-এ মোগল সুবাদারের কালানুক্রমিক ইতিবৃত্ত এবং মোগল আমলের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত রাজধানী হিসেবে ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার ইতিহাসে কিছু সম্পূর্ণ নতুন শক্তির উদ্ভব হওয়ায় ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

রাজধানী হিসেবে তার মর্যাদা হারাতে থাকে এবং কেবল একটি *নিয়াবত* অর্থাৎ নায়েব–নাযিম (ডেপুটি গভর্নর)–এর প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঢাকায় বসবাসকারী শেষ সুবাদার আজিম-উশ-শান

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ১৬৯৬ সালে মেদেনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার জমিদার শুভ সিংহ এবং উড়িষ্যার আফগান সরদার রহিম খান যৌথভাবে মোগল শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বাংলার দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করেন।[২০] অলস ও গ্রন্থকীট সুবাদার ইব্রাহিম খান এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে সুবাদারের পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং সম্রাটের পৌত্র শাহজাদা আজিম উদ্দিনকে (যাঁকে ১৭০৭ সালে তাঁর পিতা সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ আজিম–উশ–শান উপাধি প্রদান করেন) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগদান করেন।[২১] নবনিযুক্ত শাহজাদা বিদ্রোহ দমনে সফল হন। কিন্তু ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি *সওদা–ই–খাস* নামের ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন [২২] সম্রাট যুবরাজের এ ধরনের কার্যকলাপের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে এ ধরনের নীতিবহির্ভূত কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। তিনি অচিরেই করতলব খান নামক একজন যোগ্য অফিসারকে বাংলার দিউয়ান নিযুক্ত করেন।[২৩] এ নিযুক্তি বাংলার ইতিহাসে, বিশেষত ঢাকার ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনে। নতুন দিউয়ান ঢাকা পৌঁছার পর পরই এ দেশের রাজস্ব প্রশাসনে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। এসব সংস্কারের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবাদারের প্রতিপত্তি সংকুচিত হওয়ায় তিনি রুষ্ট হন এবং দিউয়ানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। দিউয়ান ভবিষ্যতে পুনরায় এ ধরনের বিপদের আশঙ্কা করে তাঁর দিউয়ানি সংস্থাপনা ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে (পরবর্তীকালের মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তর করেন।[২৪] এদিকে ষড়যন্ত্রের খবর সম্রাটের কাছে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি শাহজাদাকে ঢাকা ত্যাগ করে বিহারে চলে যেতে নির্দেশ দেন। শাহজাদা তাঁর পুত্র ফররুখ শিয়র এবং সরবুলন্দ খানকে ঢাকায় রেখে পরিবার–পরিজনসহ বিহারের দিকে যাত্রা করেন। তিনি পাটনায় গিয়ে তাঁর বসতি স্থাপন করেন এবং সম্রাটের অনুমোদনক্রমে পাটনার নাম পরিবর্তন করে আজিমাবাদ নামকরণ করেন।[২৫]

আধুনিককালের পণ্ডিতগণ এসব ঘটনার তারিখ বিভিন্নভাবে নির্দেশ করেন। কেউ বলেন ১৪০৭ সালে আবার কেউ বলেন, ১৭০৬ সালে এসব ঘটনা ঘটেছিল। তবে ইংরেজদের লিপিবদ্ধ বিবরণের সাহায্যে এই তারিখ সঠিকভাবে সংশোধন করা যায়।[২৬]

১৭০২ সালে করতলব খান তাঁর দিউয়ানি মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৭০৩ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুর্শিদকুলী খান উপাধি লাভ করেন যাতে তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নতুন উপাধি এবং অন্যান্য সম্মান নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরার পথে তিনি ১৭০৪ সালের প্রথমদিকে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিদের এবং কটক, মেদেনীপুর ও বর্ধমানে হুগলীর ফৌজদারদের সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি মকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

শাহজাদা আজিমউদ্দিন ১৭০৩ সালে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকাস্থ ইংরেজ প্রতিনিধি কর্তৃক কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট ১৭০৩ সালে দাখিলকৃত হিসাবে খরচের একটি দফা হলো বাংলার বাইরে শাহজাদাকে এগিয়ে দেওয়ার খরচ।[২৮] ১৭০৪ সাল থেকে ইউরোপীয় কাম্পানিসমূহ ঢাকায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ বন্ধ করে। ১৭০৪ সালের প্রথমদিকে হুগলীর ফৌজদার । কোম্পানিসমূহকে পাটনায় শাহজাদার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।[২৯]

১৭০৩ হতে ১৭১৫-১৬ পর্যন্ত ঢাকার মর্যাদা

১৭০৩ সালে সুবাদার আজিমউদ্দিনের প্রস্থানের সময় থেকে ১৭১৫-১৬ খিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিক *নিয়াবত* প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালে ঢাকার মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। নাযিমের প্রস্থানের পর ফররুখ শিয়র খুব সম্ভবত ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে *নায়েব-নাযিম* বা নাযিমের প্রতিনিধিরূপে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় না। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঢাকা তাঁর পূর্বের মর্যাদা হারিয়েছিল। সুবাদারের সংস্থাপনা পাটনায় এবং দিউয়ানের সংস্থাপনা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে ঢাকা স্থানীয় প্রশাসনের সদর দফতর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে একটি অধস্তন শহরে পরিণত হয়। ১৭০৭ সাল থেকে ১৭১২ সাল পর্যন্ত ফররুখ শিয়র রাজমহলে অবস্থান করেছিলেন।[৩০] সেখানে তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন।[৩১] সে সময় কিছুদিনের জন্য আজিম-উশ-শানের পক্ষে সরবুলন্দ খান বাংলার ডেপুটি সুবাদার ছিলেন। কিন্তু তিনি সাধারণত মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন।[৩২] প্রথমে ফররুখ শিয়রের শিশুপুত্র ফরখুন্দা শিয়র জাহাঙ্গীর শাহের পক্ষে এবং পরে মুর্শিদকুলী খান অনুপস্থিত সুবাদার মীর জুমলার[৩৩] পক্ষে ১৭১৩ সালে বাংলার ডেপুটি সুবাদার হন। মুর্শিদকুলী খান সর্বদা মুর্শিদাবাদে অবস্থান করতেন। ১৭১৫-১৬ সালে মুর্শিদকুলী খান বাংলার পূর্ণাঙ্গ সুবাদারি লাভ করেন।[৩৪] খুব সম্ভবত তখন থেকেই সুবাদারের পক্ষে *নায়েব-নাযিম* দ্বারা ঢাকা শাসিত হতো[৩৫]

ঢাকার নায়েব-নাযিমগণ

এ দেশের শাসনক্ষমতা ইংরেজদের করায়ত্ত হওয়া পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী ছিল এবং ঢাকা ছিল নায়েব-নাযিমদের শাসনকেন্দ্র।[৩৬] নায়েব-নাযিমদের কালক্রমে, এখনো সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের (১৭২৭-১৭৩৯) সময় থেকে আলিবর্দী খানের (১৭৫৬) মৃত্যু পর্যন্ত নায়েব-নাযিমদের কালক্রম জে.টি রেনকিন[৩৭] এর ঢাকা ডায়রী এবং বিশেষ করে ফার্সি ভাষায় প্রণীত ইতিহাসগ্রন্থ *সিয়ার-উল-মুতাখখেরিনের* আলোকে অনেকটা স্পষ্ট। আবার পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরের কালক্রমও সন্তোষজনকভাবে নির্ণীত হয়নি। ঢাকা ও কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির দলিলদস্তাবেজের ভিত্তিতে এখন নায়েব-নাযিমদের কালক্রম সন্তোষজনকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

ঢাকার প্রথম নায়েব-নাযিম হিসেবে যাঁর নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন খান মুহাম্মদ আলী খান (কাগজপত্রে আছে মাউন্ডি)। মাত্র একটি দলিলে একবারই তাঁর নাম পাওয়া যায়। সে দলিলটি হলো ১৭১৭ সালের ২৩শে জুলাই মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক তাঁর নিকট জারিকৃত

www.nagorikpathagar.org

একটি পরোয়ানার ইংরেজি অনুবাদ। এই পরোয়ানায় তাঁকে তাঁর এলাকায় ইংরেজ বণিকদের নিগৃহীত করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৩৮] তিনি কখন নিয়োগলাভ করেছিলেন তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, তিনি ১৭১৫-১৬ সালে ঢাকার নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন, কারণ মুর্শিদকুলী খান (তাঁর নিয়োগকর্তা) ঐ সময়েই নাযিম নিযুক্ত হন। ইংরেজ কোম্পানি ১৭২৩ সালে ঢাকায় বাণিজ্যকুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং ঢাকায় কোম্পানির বাণিজ্যিক বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্য একটি কাউন্সিল নিয়োগ করে। জন স্টেকহাউজের নেতৃত্বে এই কাউন্সিল ১৭২৩ সালের ১৯শে এপ্রিল ঢাকায় পৌঁছে।[৩৯] ঢাকা কাউন্সিল কর্তৃক তাঁদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কলকাতা কাউন্সিলকে লিখিত পত্রসমূহে ঢাকার পরবর্তী নায়েব-নাযিমদের নাম পাওয়া যায়।

জন স্টেকহাউস এবং তাঁর কাউন্সিলররা ঢাকা পৌঁছে ইতিসাম খানকে[৪০] ঢাকার নায়েব-নাযিম হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ইংরেজদের সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।[৪১] ঢাকা কাউন্সিল নবাবের আনুকূল্য লাভ এতটা নিশ্চিত বলে মনে করেছিলেন যে, যেসব সৈন্য নিরাপত্তার জন্য কাউন্সিলরদের সাথে ঢাকায় এসেছিল তাদেরকে কাউন্সিল কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়।[৪২] ই'তিসাম খান কখন ঢাকায় নায়েব-নাযিম পদে অধিষ্ঠিত হন তা জানা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৭১৭ সালে যখন মুহাম্মদ আলী খানের নাম নায়েবরূপে পাওয়া যায়, তখন থেকে ১৭২৩ সালে ই'তিসাম খান উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ের মধ্যে কারা নায়েব-নাযিম ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ই'তিসাম খানের উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার শেষ দিনটি জানা যায়। ১৭২৬ সালের ৯ই মার্চ ঢাকা কাউন্সিল একটি পত্রের দ্বারা কলকাতা কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, নবাব ই'তিসাম খান পরলোকগমন করেছেন।[৪৩] ই'তিসাম খানের মৃত্যুর পর নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর (ই'তিসাম খানের) পুত্রকে ঢাকার নায়েব-নাযিম হিসেবে নিয়োগদান করেন।[৪৪] কিন্তু এঁর নাম কোথাও পাওয়া যায়নি। অথচ ইনি মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু (জুন ১৭১৭) পর্যন্ত অর্থাৎ সম্ভবত ঐ বছরের শেষদিন পর্যন্ত ঢাকার নায়েব-নাযিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৪৫]

সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণের পর তাঁর জামাতা মির্জা লুৎফুল্লাহকে (তিনি মুর্শিদকুলী খান উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং পরলোকগত নাযিম থেকে পৃথক ব্যক্তি হিসেবে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান নামে পরিচিতি লাভ করেন) ঢাকার নায়েব-নাযিম হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ঢাকা কাউন্সিলের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে এই নতুন নবাব ১৭২৮ সালের ১৫ই এপ্রিলের পূর্বে ঢাকায় এসে পৌঁছেছিলেন।[৪৬]

সলিমুল্লাহ এবং তাঁকে অনুসরণ করে গোলাম হুসেন সলীম লিখেছেন যে, মুর্শিদকুলী খান মির্জা লুৎফুল্লাহকে ঢাকার নায়েব-নাযিম হিসেবে নিয়োগদান করেছিলেন।[৪৭] তাঁদের অনুসরণে আধুনিক পণ্ডিতগণ মির্জা লুৎফুল্লাহকে ঢাকার প্রথম নায়েব-নাযিম বলে মনে করেন এবং জেম্‌স্ টেলর ১৭১৩ সালকে তাঁর নিয়োগলাভের তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৮] বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির *ডায়রী এন্ড কন্‌সালটেশন*-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে উল্লিখিত সমুদয় ধারণা স্পষ্টত ভ্রান্ত। এ সকল লেখক ১৭১৫ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ঢাকার নায়েব-নাযিমদের নাম আদৌ উল্লেখ করেননি, যাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম এখন পাওয়া যায়। আযাদ আল-হুসাইনি কর্তৃক মির্জা লুৎফুল্লাহ্‌র সম্মানে রচিত *নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী*

www.nagorikpathagar.org

খান নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান মির্জা লুৎফুল্লাহকে ঢাকার নায়েব-নাযিম নিয়োগ করেছিলেন।[৪৯]

এই সময় থেকে আলীবর্দী খানের মৃত্যু পর্যন্ত ঢাকার নায়েব-নাযিমদের নাম ফার্সি ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এবং ঢাকা কাউন্সিলের *ডায়রী এন্ড কন্‌সালটেশন*-এ পাওয়া যায়, যা ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ড নামে পরিচিত। সমসাময়িক গ্রন্থসমূহে নায়েব-নাযিমদের সময়কাল কদাচিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজদের দলিলদস্তাবেজে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। জে.টি. রেনকিন[৫০] ছিলেন প্রথম পণ্ডিত, যিনি *ঢাকা ডায়রীর* উপর ভিত্তি করে একটি ধারাবাহিক কালপঞ্জি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালের লেখকগণ গ্রহণ করেছেন। নিম্নে বর্ণিত কালপঞ্জি ঢাকা *ফেক্টরি রেকর্ড* (রেনকিনের ঢাকা ডায়রী)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

মির্জা লুৎফুল্লাহকে ১৭৩৪ সালে উড়িষ্যায় বদলি করা পর্যন্ত তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন।[৫১] সুজা-উদ-দীন মুহাম্মদ খানের পুত্র সরফরাজ খান (যিনি পরবর্তীকালে ১৭৩৯-৪৭ সালে বাংলার নবাব ছিলেন) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সরফরাজ খান কখনও নিজে ঢাকায় আসেননি। তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঢাকা শাসন করতেন। তাঁর প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন গালিব আলী খান, যাঁর সহকারী ছিলেন যসন্ত রায় দিউয়ান। ১৭৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গালিব আলী খানকে ডেকে পাঠানোর খবর ইংরেজরা পেয়ে যায়।[৫২] সরফরাজ খান অতঃপর তাঁর ভাগিনা (তাঁর বোন এবং সৈয়দ রেজা খানের স্ত্রী নফিসা বেগমের ছেলে) এবং জামাতাকে ঢাকার নায়েব নিয়োগ করেন। এ ব্যক্তির নাম নিয়ে জে. টি. রেনকিন বিভ্রান্তিতে পড়েন। কারণ তিনি বলেন যে, তাঁর নাম *ঢাকা ডায়রীতে* লিপিবদ্ধ রয়েছে সৈয়দ রেজা খান এবং রিয়াজে লিখিত রয়েছে মুরাদ আলী খান।[৫৩] ইংরেজরা ১৭৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে সৈয়দ রেজা খান বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] কিন্তু একই সালের ২১শে জুন তাঁর নাম সংশোধন করে বলা হয় সৈয়দ মুরাদ আলী খান।[৫৫] তিনি ছিলেন মুর্শিদকুলী খানের (১৭১৭-২০) আমলে বাংলার দিউয়ান সৈয়দ রাজি খানের পুত্র। মুর্শিদকুলী খান ১৭২০ সালে পরলোকগমন করেন।[৬] ইংরেজদের দলিলপত্রে পূর্বেকার গরমিলের কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ইংরেজরা তাঁর নামকে তাঁর পিতার নাম বলে ভুল করেছিল। পরবর্তী সময়ে নতুন নবাব ঢাকা পৌছালে ইংরেজরা তাঁর নাম সংশোধন করে নেয়। কিন্তু এ সংশোধন জে. টি. রেনকিনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সরফরাজ খানের প্রতিনিধি হিসেবে সৈয়দ মুরাদ আলী খান ১৭৩৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। সে সময় সরফরাজ খান বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তাঁর শ্বশুর ও মামা তাঁর পদোন্নতি প্রদান করেন। ঢাকার পরবর্তী নায়েব-নাযিম ছিলেন আবদুল ফাত্তাহ্ খান, যিনি ১৭৩৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন।[৫৭]

১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দী খান গিরীয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে হত্যা করে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন। এর পর পরই তিনি তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিস মুহাম্মদ খানকে (যাঁর উপাধি ছিল শাহমত জঙ্গ) ঢাকার নায়েব-নাযিম নিয়োগ করেন। সরফরাজ খানের মতো নওয়াজিস মুহাম্মদ খানও তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঢাকা শাসন করতেন। ঢাকার ফেক্টরি রেকর্ডে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নওয়াজিস মুহাম্মদ খানের নিয়াবতকালে তাঁর প্রতিনিধিদের কালপঞ্জি নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। জে. টি. রেনকিন

www.nagorikpathagar.org

কালপঞ্জি নির্ণয়ের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী লেখকগণ তারিখ নির্ণয় না করে সিয়ার-উল-মুতাখখেরিনের সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণ করেছেন।[৫৮] *সিয়ার-উল-মুতাখখেরিনে* আমরা নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পাই।

নওয়াজিস মুহাম্মদ খান হুসেন কুলী খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কিন্তু হুসেন কুলী প্রাক্তন দিউয়ান জনৈক গোকুল চাঁদ তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে তাঁকে (হুসেন কুলী খানকে) পদচ্যুত করেন। ঢাকার ফৌজদার ইয়াসিন খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অন্যদিকে হুসেন কুলী খান মুর্শিদাবাদ গিয়ে ঘসেটি বেগমের (আলিবর্দী খানের কন্যা এবং নওয়াজিস মুহাম্মদ খানের স্ত্রী) অনুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভ করে নিজেকে পুনরায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি ঢাকায় পৌঁছে গোকুল চাঁদকে পদচ্যুত করেন এবং সেই পদে রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন। তখন থেকে রাজবল্লভ প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। হুসেন কুলী খান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনউদ্দিন খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে সত্বর ঢাকা ত্যাগ করেন।

ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৭৪১ সালের ২রা জানুয়ারি ঢাকা কাউন্সিল লিপিবদ্ধ করে যে, হুসেন কুলী খান এখানে নবাব হয়ে আসছেন।[৫৯] একই সালের ২৯শে জানুয়ারি তারা লিপিবদ্ধ করে যে, তারা নবাবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও নবাব তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন[৬০] , যা প্রমাণ করে যে, হুসেন কুলী খান উল্লিখিত তারিখের আগেই ঢাকা পৌঁছেন। ১৭৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা কাউন্সিল নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ দরবারের কর্মকর্তাদের উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে[৬১]:

	সিককা টাকা
নওয়াজিস মুহাম্মদ খান (নায়েব-নাযিম)	২,০০০
হুসেন কুলী খান	১.০০০
দউয়ান বৃন্দাবন	১,০০০
হাজী হুসেন	৪১০
দরবারের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ	৩৬০

১৭৪৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকা কাউন্সিল একজন নতুন নবাবের নাম উল্লেখ করে।[৬২] কাউন্সিল ১৭৪৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে হুসেন কুলী খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকার নবাবের কাছে প্রেরিত পত্রের উল্লেখ করে।[৬৩] কাউন্সিল ১৭৪৮ সালের ২৫শে জুন হুসেন কুলী খানের সমীপে ঢাকাস্থ তাঁর প্রতিনিধির অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৪] ১৭৫৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কাউন্সিল জানতে পারে যে, মুরাদ দৌলতকে ঢাকার নবাব নিয়োগ করে প্রেরণ করা হয়েছে।[৬৫]

ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ডে প্রাপ্ত তারিখসমূহ এবং *সিয়ার-উল-মুতাখখেরিনে* বর্ণিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত কালপঞ্জি প্রস্তুত করা হলো।

১৭৪০ সালে আলিবর্দী খানের মুর্শিদাবাদ মসনদে আরোহণের সময় থেকে ১৭৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নওয়াজিস মুহাম্মদ খান ঢাকার অনুপস্থিত নায়েব-নাযিম ছিলেন। তিনি হুসেন কুলী খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, যিনি ১৭৫৪ সালে নিহত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু হুসেন কুলী খান নিজে ১৭৪৪ সাল

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত ঢাকায় বসবাস করেন। *সিয়ার-উল মুতাখখেরিনে* বর্ণিত গোকুল চাঁদের ষড়যন্ত্র যদি আদৌ সত্য হয়ে থাকে, তবে তা ১৭৪০ ও ১৭৪৪ -এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। ১৭৪৪ সালের শেষদিকে হুসেন কুলী খান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনউদ্দিন খানকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। হুসেন কুলী খান এবং হুসেনউদ্দিন খান উভয়ে ১৭৫৪ সালে নিহত হন। সুতরাং নওয়াজিস মুহাম্মদ খান তাঁর জীবনের শেষ বছরে মুরাদ দৌলতকে ঢাকায় প্রতিনিধি বা ঢাকার পূর্ণাঙ্গ নায়েব-নাযিম নিযুক্ত করেন। সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণ করে জেসারত খানকে ঢাকার নায়েব-নাযিম হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। ১৭৫৬-৫৭ সালে যখন সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান ছিল, তখন নবাব জেসারত খানকে ঢাকা ফেক্টরির সকল ইংরেজকে বন্দী করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যা হোক, জেসারত খান ইংরেজদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে তাদেরকে ফরাসি ফেক্টরিতে আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, যদিও তিনি ইংরেজদের সম্পদ হস্তগত করেছিলেন।[৬৬]

১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের দলিলপত্র এত অপর্যাপ্ত ছিল যে, এ সময়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা খুবই কঠিন। মনে হয়, জেসারত খান ১৭৬২ হতে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।[৬৭] ১৭৬৩ সালে যখন মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তখন সিরাজউদ্দৌলার আমলে ইংরেজদের প্রতি জেসারত খানের সদয় আচরণের কারণে মীর কাশিম তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং জনৈক মুহাম্মদ আলীকে নিযুক্ত করেন।[৬৮] কিন্তু ১৭৬৩ সালে মীর জাফর দ্বিতীয় বারের মতো মসনদে আরোহণ করার পর মুহাম্মদ রেজা খানকে ঢাকার নায়েব-নাযিম নিযুক্ত করেন।[৬৯] মুহাম্মদ রেজা খান আনুমানিক দুই বছর চাকুরি করার পর ১৭৬৫ সালে মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে বাংলার নায়েব-নাযিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৭০] ইংরেজদের প্রতি অতীতে প্রদর্শিত আনুকূল্যের কারণে তাঁরা জেসারত খানকে ঢাকার নায়েব-নাযিম নিয়োগ করার সুপারিশ তাঁদের সুপারিশক্রমে নবাব নিযাম-উদ্-দৌলা ১৭৬৫ সালে জেসারত খানকে ঢাকার নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন।[৭১] জেসারত খান অসুস্থতার কারণে তাঁর পৌত্র হাসমত জঙ্গের পক্ষে ১৭৭৮ সালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং ১৭৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে নায়েব-নাযিমদের কালপঞ্জি সন্তোষজনকভাবে নির্ণয় করেছেন এস. সি. ব্যানার্জী।[৭২] এখন ঢাকার নায়েব-নাযিমদের একটি পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব। তালিকাটি নিম্নরূপ :

১.	খান মুহাম্মদ আলী খান		১৭১৭
২.	ই'তিসাম খান	আনুমানিক	১৭২৩-১৭২৬
৩.	ই'তিসাম খানের পুত্র, যাঁর নাম জানা যায়নি		১৭২৬-১৭২৭
৪.	মির্জা লুৎফুল্লাহ		১৭২৮-১৭৩৪
৫.	সরফরাজ খান		১৭৩৪-১৭৩৯
	তাঁর প্রতিনিধি	(ক) গালিব আলী খান	১৭৩৪-১৭৩৮
		আনুমানিক	
		(খ) মুরাদ আলী খান	১৭৩৮-১৭৩৯

www.nagorikpathagar.org

৬.	আবদুল ফত্তাহ খান		১৭৩৯–১৭৪০
৭.	নওয়াজিস মুহাম্মদ খান		১৭৪০–১৭৫৪
	তাঁর প্রতিনিধিদ্বয়	(ক) হুসন কুলী খান	১৭৪০–১৭৪৪
		হুসেনউদ্দিন খান	১৭৪৪–১৭৫৪
	তাঁর প্রতিনিধি	(খ) মুরাদ দৌলত	১৭৫৪–১৭৫৫
৮.	জেসারত খান		১৭৫৫–১৭৬২
৯.	মুহাম্মদ আলী		১৭৬২–১৭৬৩
১০.	মুহাম্মদ রেজা খান		১৭৬৩–১৭৬৫
১১.	জেসারত খান (৮ সংখ্যক ব্যক্তি)		১৭৬৫–১৭৭৮
১২.	হাসমত জঙ্গ		১৭৭৮–১৭৮৫
১৩.	নুসরত জঙ্গ		১৭৮৫–১৮২২
১৪.	শমসুদ্দৌলাহ		১৮২২–১৮৩১
১৫.	কমর-উদ-দৌলাহ		১৮৩১–১৮৩৪
১৬.	গাজী-উদ-দীন হায়দার		১৮৩৪–১৮৪৩

টীকা

১. স্টুয়ার্ট, *History of Bengal,* পৃঃ –২৩২–২৩৩, ২৩৭।

২. *Dacca University Studies,* ভল্যুম-১, সংখ্যা-১ নভেম্বর, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬–৬৩।

৩. *বাহারিস্তান,* ভল্যুম-১, পৃঃ ৯, ৪৫।

৪. *Dacca University Studies,* ভল্যুম-১, সংখ্যা-১, নভেম্বর, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬–৬৩।

৫. *B. P. P.* ভল্যুম-৫১, ১৯৩৬, পৃঃ ৪৮–৪৯।

৬. *বাহারিস্তান,* ভল্যুম-২, পৃঃ ৮১৩–৮১৪।

৭. তুলনীয়, এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃঃ ৩১ ; তাইফুর, Glimses of old Dhaka,

৮. *H. B.* পৃঃ ২৭০–২৭২।

৯. *বাহারিস্তান,* ভল্যুম-১, পৃঃ ৯,২৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫,৬৪।

১১. *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী,* পৃঃ ২০৮।

১২. *বাহারিস্তান,*, ভল্যুম-১, পৃঃ ৩–৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮–১৩।

২—

www.nagorikpathagar.org

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

১৬. *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী,* পৃঃ ২০৯,২১৪।

১৭. তুলনীয়, *ইকবালনামা,* পৃঃ ৬১-৬৪, *মাসীর-উল-উমরা,* ভল্যুম-২, পৃঃ ৬৩০,৬৩৩।

১৮. এই. এইচ. দানী মন্তব্য করেন যে, "এ অন্তর্বর্তী সময়েও ঢাকা সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে রাজধানীই ছিল। এতে ক্রমবর্ধমান শহরের বিকাশ ব্যাহত হয়।" (দানী : Dacca পৃঃ ৩১)। কিন্তু সুবাদারের সঙ্গে রাজধানী এবং তাঁর সকল সংস্থাপনা ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। শহরের সম্প্রসারণের অর্থ এই নয় যে, সেখানে রাজধানী ছিল। বরং অন্যান্য কারণেও শহরের সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল, যেমন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ।

১৯. *History of Bengal,* ভল্যুম-২ (পৃঃ ২২৮-২৩৩) অনুসারে বাংলার সুবাদারদের নাম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেওয়া হলো। ঢাকায় রাজধানী থাকাকালীন সময়ের তালিকা) :

১. ইসলাম খান চিশতি—১৬০৮-১৬১৩ (ঢাকায় -১৬১০-১৩)।

২. কাশিম খান চিশতি —১৬১৩-১৬১৭।

৩. ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ— ১৬১৭-১৬২৪।

৪. মহব্বত খান— ১৬২৫-১৬২৭।

৫. মুকাররাম খান— ১৬২৬-১৬২৭।

৬. ফিদাই খান— ১৬২৭-১৬২৮।

৭. কাশিম খান জুয়িনী— ১৬২৮-১৬৩২।

৮. আজম খান মীর মুহাম্মদ বাকির— ১৬৩২-১৬৩৫।

৯. ইসলাম খান মাশহাদী— ১৬৩৫-১৬৩৯।

১০. শাহ সুজা— ১৬৩৯-১৬৬০ (শাহ সুজার অনুপস্থিতিতে ১৬৪৭-১৬৪৮ এক বছর ফিদাই খান ভারপ্রাপ্ত সুবাদার ছিলেন)।

১১. মীর জুমলা— ১৬৬০-১৬৬৩।

১২. শায়েস্তা খান— ১৬৬৩-১৬৭৮ এবং পুনরায় ১৬৭৯-১৬৮৮।

১৩. ফিদাই খান (আজম খান কোকা)— ১৬৭৮।

১৪. শাহজাদা আজম শাহ ১৬৭৮-১৬৭৯।

১৫. খান-ই-জাহান— ১৬৮৮-১৬৮৯।

১৬. ইব্রাহিম খান— ১৬৮৯-১৬৯৮।

১৭. শাহজাদা আজিম-উদ-দীন— ১৬৯৮-১৭১২।

২০. *তারীখ* এফ. ৪ বি: রিয়াজ, পৃ: ২২৪।

২১. *তারীখ* এফ. ৫ এ; রিয়াজ, পৃ: ২৩৩।

২২. *তারীখ* এফ ২৪ বি; রিয়াজ, পৃ: ২৪৪, এ নীতির দ্বারা শাহজাদার নিযুক্ত প্রতিনিধি বন্দরে আমদানি ও রপ্তানিসামগ্রী ক্রয় করে এবং তা পরে উচ্চমূল্যে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে।

www.nagorikpathagar.org

২৩. *তারীখ* এফ, ২৫বি; রিয়াজ, পৃ: ২২৪।

২৪. *তারীখ* এফ. ২৯এ; *রিয়াজ*, পৃ: ২৪৯।

২৫. *তারীখ* এফ. ২৯বি; *রিয়াজ*, পৃ: ২৫০।

২৬. গ্রন্থকার অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেখুন, *Murshid Quli Khan and His Times*, পৃ: ২২–২৪। এখানে শুধু তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

২৭. *B.P.C*, ২০শে হে, ৮পৃ. জুন, ১৭০৪।

২৮. প্রাগুক্ত, ২রা মার্চ, ১৭০৮।

২৯. প্রাগুক্ত, ২১ শে মার্চ, ১৭০৪।

৩০. ১৭০৮ সালে ইংরেজ কোম্পানি রাজমহলে শাহজাদার দরবারে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, *B.P.C* ২৬শে এপ্রিল, ৩০শে জুন, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭০৮।

৩১. উইলিয়াম অরভিন, *Later Mughals*, ভল্যুম- ১, পৃ: ১৯০–২০১।

৩২. ইংরেজ কাউন্সিল এডওয়ার্ড পেটলের মাধ্যমে কাশিম বাজার হতে একখানা পরোয়ানা লাভের চেষ্টা করেন। দেখুন, *B.P.C* ২৯ সেপ্টেম্বর ১৭০৯।

৩৩. তাঁর আসল নাম শরীয়তউল্লাহ, পরে ওবায়েদউল্লাহ এবং তিনি ঢাকার কাজী ছিলেন। তাঁর অনুরোধক্রমে লালবাগ দুর্গের নিকটে আতিশখানায় খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ নির্মিত হয়। ১৭১৩ সালে ফররুখ সিয়র ক্ষমতা লাভ করলে তাঁকে মীর জুমলা উপাধি প্রদান করা হয়। উইলিয়াম অরভিন, *Later Mughals*, ভল্যুম–১, পৃ: ২৪৮–২৬৩।

৩৪. সাধারণত ধারণা করা হতো যে ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার হন। কিন্তু অতি সম্প্রতি তা সংশোধন করা হয়েছে। দেখুন, এ. করিম, *Murshid Quli Khan and His Times*, পৃ: ৫৩–৫৫।

৩৫. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *"The chronology of the early Naib-Nazims of Dacca, Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, ভল্যুম–৮, নং ১, পৃ: ৬৭–৭১।

৩৬. ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার নায়েব–নাযিম ছিলেন। তন্মধ্যে ১৭৬৫ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত সীমিত ক্ষমতার অধিকারী এবং ১৮২২ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত উপাধিধারী এবং পেনশনভোগী ছিলেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *Bengal: Past and Present*, ভল্যুম- ৫৯, ১৯৪০, পৃ: ১৭–২৯।

৩৭. জে. টি. রেনকিন, *Dacca Diaries, Journal of the Asiatic Society of Bengal*, ভল্যুম–১৬, এন. এস, ১৯২০।

৩৮. *Home Miscellaneous Series*, ভল্যুম- ৬৩০।

৩৯. *B.P.C*, ২৯শে এপ্রিল, ১৭২৩।

www.nagorikpathagar.org

৪০. ইংলিশ রেকর্ডে তাঁর নাম লিখা আছে ই'তিসাম খান। আমরা হরিনাথ দেব সম্পাদিত *Memories of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-২, সংখ্যা ৬-এ প্রকাশিত *তারিখ-ই-নসরত জঙ্গীর* প্রথম পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুসারে তাঁর নামের সঠিক বানান ই'তিসাম খান গ্রহণ করলাম।

৪১. *B.P.C,* ২৯শে মে, ১৭২৩।

৪২. *B.P.C,* ৩শে জুন, ১৭২৩।

৪৩. প্রাগুক্ত, ২১শে মার্চ, ১৭২৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, ২১শে মার্চ, ১৭২৬। তাছাড়া ১৭২৬ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে কাশিম বাজার থেকে পাঠানো পত্রেও তা জানা যায়।

৪৫. ১৭৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা কাউন্সিলের এক পত্রে জানা যায় যে ই'তিসাম খান এবং তাঁর পরিবার সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের আত্মীয় (BPC) ২৯শে মার্চ, ১৭৩১)। যেহেতু সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান নবাব মুর্শিদকুলী খানের জামাতা, সেহেতু ই'তিসাম খানের পরিবারও মুর্শিদকুলী খানের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল, যদিও তারা কতুটুকু নিকট-আত্মীয় তা জানা যায়নি।

৪৬. *B.P.C,* ১৫ই এপ্রিল, ১৭২৮।

৪৭. *তারীখ-এফ, ৫৯এ; রিয়াজ,* পৃ: ২৭৫।

৪৮. এ. এইচ. দানী *Dacca,* পৃ: ৫০; এইচ. বি. পৃ: ৪২৬; *Topography,* পৃ: ৮১।

৪৯. জে. এন. সরকার, *Bengal Nawabs,* পৃ: ৩।

৫০. জে. টি. রেনকিন, *Dacca Diaries, Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-১৬, এন. এস, ১৯২০।

৫১. এইচ. বি. , পৃ: ৪২৬।

৫২. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২, *Consultation,* ২৯শে ডিসেম্বর, ১৭৩৭।

৫৩. *journal of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-১৬ এন. এস. ১৯২০-১৩৪।

৫৪. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২, *Consultations* প্রথম, ১০ই আগস্ট, ১৭৩৭, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৩৮।

৫৫. প্রাগুক্ত, ২১শে জুন ১৭৩৮।

৫৬. *B. P. C.* ৩রা অক্টোবর, ১৭২০ তাঁর মৃত্যুরেকর্ড করা হয়।

৫৭. *Dacca Factory Records,* ভল্যম-২, *Consultations,* ২রা জানুয়ারি, ১৭৪১।

৫৮. কে. কে. দত্ত, *Alivardi and His Times,* পৃঃ ৩৮, ৫৭।

৫৯. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২, *Consultations* প্রথম, ১০ই আগষ্ট, ১৭৩৭, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৩৮।

৬০. প্রাগুক্ত, ২৯শে জানুয়ারি, ১৭৪১।

www.nagorikpathagar.org

৬১. প্রাগুক্ত, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪৪।

৬২. প্রাগুক্ত, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৭৪৪।

৬৩. প্রাগুক্ত, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৭৪৫।

৬৪. প্রাগুক্ত, ২৫শে জুন, ১৭৪৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, ভল্যুম-৩, *Consultation,* ৩০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৪।

৬৬. ব্রেডলী বার্ট, *Romance of an Eastern Capital,* পৃঃ ২০৩–২০৮।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

৬৮. মুহাম্মদ আলীর নিকট থেকে মুহাম্মদ রেজা খান ঢাকার নিয়াবতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-৮–এ মুহাম্মদ রেজা খানের ঢাকার রাজস্বের হিসাব দেখুন।

৬৯. *সিয়ার উল-মুতাখখেরীন,* ভল্যুম-৩, পৃঃ -৪ ; *Secret Consultations,* রেঞ্জ এ, ভল্যুম-৫, ২রা এবং ১৬ই জানুয়ারি ১৭৬৪ ; রেঞ্জ এ, ভল্যুম-৬, ১৩ই ডিসেম্বর ১৭৬৪।

৭০. *Secret Consultation,* রেঞ্জ–এ, ভল্যুম-৬, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫।

৭১. প্রাগুক্ত, ২৬শে মার্চ, ২২শে এপ্রিল ১৭৬৫।

৭২. এস. সি. ব্যানার্জী, *Naib-Nazims of Dhaka, Bengal past and present,* ভল্যুম-৫৯, ১৯৪০, পৃঃ ১৭–২৯।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
ঢাকা শহরের বিকাশ

প্রাক মোগল আমলে ঢাকা

প্রাক মোগল আমলের ঢাকার ইতিহাস আজো অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়ে গেছে। সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর[১] হরিশঙ্করের মূর্তি আবিষ্কার এতদঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রদান করে। কিন্তু এসকল প্রাচীন উপাদান এর চেয়ে বেশি কিছু ধারণা প্রদান করে না যে, ইতিহাসের আদিপর্বে এ এলাকায় জনবসতি ছিল। ঢাকা শহরে মাত্র দুটি প্রাকমোগল মুসলিম শিলালিপি পাওয়া গেছে এবং আরো একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে আধুনিক ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে মিরপুরে।[২] এসব শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের কথা উৎকীর্ণ রয়েছে এবং এগুলো প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় মুসলিম বসতি বিদ্যমান ছিল।

মোগল রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা

'ঢাহাখা' নামক একটি প্রাচীনতম স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় বীরভূম জেলায় আবিষ্কৃত ১৪৬০ সালের সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবাক শাহেব একখানি শিলালিপিতে[৩] কিন্তু এ শিলালিপিতে বর্ণিত স্থান ও আধুনিক ঢাকা একই স্থান কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ঢাকা সম্পর্কিত পরবর্তী এবং সন্দেহাতীত সূত্র হচ্ছে আনুমানিক ১৫৫০ সালে অঙ্কিত জোয়াও ডি ব্যারোস-এর মানচিত্র। আধুনিক কোনো কোনো পণ্ডিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপিতে বর্ণিত 'দাভাকাকে' ঢাকা বলে মনে করেন।[৪] যদি তা না হয়, তাহলে ঢাকা সম্পর্কিত প্রাপ্ত প্রাচীনতম সূত্র হলো ডি ব্যারোস-এর মানচিত্র। রাজা টোডরমল ১৫৮২ সালে বাংলার যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনা অনুসারে ঢাকা বাজু নামক একটি পরগনা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল।[৫] একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে ঢাকার প্রাচীনতম বর্ণনা পাওয়া যায় *আকবরনামায়*। কারণ ১৫৮৩ থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত সম্রাট আকবরের মোগল সেনাপতিরা ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন *আকবরনামায়* তার বিবরণ আছে।[৬] তখনকার দিনে একটি থানা হিসেবে ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঢাকা একজন থানাদারের প্রশাসনাধীন ছিল বলে জানা যায়। এই সময়কালকে ঢাকা শহর অথবা সরকার বাজুহার অধীন ঢাকা বাজু পরগনা গড়ে উঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেহেতু এই সময়ে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো, সেহেতু একটি থানা বলতে বোঝাতো আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষার জন্য কয়েক শত, এমন কি কয়েক

www.nagorikpathagar.org

হাজার সৈন্যের ছাউনি বা ক্যান্টনমেন্ট। তা ছাড়া যেহেতু সমগ্র এলাকাটা ছিল খাল-নদীতে পরিপূর্ণ, যেগুলোর কয়েকটি শহর বা তার আশপাশে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং যেহেতু এর চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বছরে প্রায় ছয়মাস প্লাবিত থাকতো, সেহেতু প্রয়োজনের সময় নৌবাহিনীর সহায়তা লাভের জন্য থানায় সেনাছাউনির ব্যবস্থা করা হতো। স্বাভাবিকভাবে সেনাছাউনিতে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনেই ব্যবসায়ী এবং দোকানদার শ্রেণী এখানে এসে ভিড় জমাতো এবং তাদের কর্মতৎপরতার ফলে এই অঞ্চলটি শহরে পরিণত হয়। আধুনিক বিবেচনায় পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত স্থানকে শহর বলা যায়। এভাবেই সেই সময়ে মোগল থানাকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহর হিসেবে গড়ে উঠে। কিন্তু ঢাকা গৌরব ও প্রাধান্য অর্জন করে ১৬১০ সালে, ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক এখানে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর।

ঢাকা শহরের বিকাশে যে শক্তিসমূহের অবদান ছিল

ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত ঢাকা রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকায় ঢাকা অনিবার্যভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। সম্ভবত ইসলাম খানের আমলে একমাত্র সরকারি দালান ছিল কেল্লা। কারণ বাহারিস্তানে অন্য কোনো দালানের উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং সরকারি কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শহরের সম্প্রসারণ ঘটে এবং তারই সাথে সাথে দালানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সুবাদার, দিউয়ান, বখশি ও অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার সামরিক ও বেসামরিক লোকের জন্য বিশাল সংস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। ঢাকায় মোগল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ঢাকা কেল্লার[৭] চারপাশে যেসকল বসতি এলাকা গড়ে উঠেছে, তাদের নাম দেখে আজও সহজে অনুমান করা যায় কিভাবে ঢাকা শহরের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উর্দু রোড একটি সেনাছাউনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেওয়ানবাজার, বখশিবাজার, মোগলটুলী, হাজারীবাগ, পিলখানা, আতিশখানা, মাহুতটুলী ইত্যাদি সহজেই সাক্ষ্য দেয় যে, এসকল এলাকায় কোনো না কোনো সময়ে মোগল সামরিক অথবা বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের সহযোগীরা বসতি স্থাপন করে রাজধানী শহরকে সম্প্রসারিত করেছিল। কায়েতটুলী মোগল সরকারের হিন্দু লেখক সম্প্রদায় কায়স্থদের আবাসস্থলের স্বাক্ষর বহন করে।

সরকারি সংস্থাপনা ছাড়াও ঢাকা শহরের বিকাশের পেছনে আরো দুটি উপাদানের অবদান রয়েছে—ভূসম্পত্তি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ। প্রশাসনিক সদর দফতর হিসেবে ঢাকার দুটি প্রধান ভূমিকা ছিল—(১) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং স্বাধীন ভূঁইয়াদের দমন করা এবং (২) রাজকীয় রাজস্ব গ্রহণ এবং রাজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এ দুই ভূমিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখা, সড়ক ও জনপথকে চোর-ডাকাতের উৎপাত থেকে এবং জনপথকে জনদস্যুদের হাঙ্গামা থেকে মুক্ত রাখা। রাজকীয় রাজস্ব সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—'ভূমিরাজস্ব, যাকে সাধারণত 'মাল' বলা হতো এবং আমদানি-রপ্তানি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, মুদ্রানির্মাণ ও ব্যাংকারদের দ্বারা মুদ্রাবিনিময় বাবদ দেয় শুল্ক এবং কর্মকর্তা, জমিদার ও জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত পেশকাশ (সম্মানী), যাকে সাধারণত 'সাইর'

www.nagorikpathagar.org

বলা হতো। এসব কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজধানী হিসেবে ঢাকা ছিল এসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের কেন্দ্র। সমগ্র প্রদেশের সকল কাজকর্ম রাজকীয় কর্মকর্তাগণ ঢাকা থেকেই সম্পাদন করতেন।

প্রাদেশিক কার্যাবলী ছাড়াও শহরকেন্দ্রিক বহু কার্য ঢাকায় সম্পাদিত হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোতোয়াল শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং মুহতাসিব শহরের জনগণের নৈতিক বিষয়াদি দেখাশুনা করতেন। তাঁরা উভয়ে নিজস্ব সংস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু সরকারি সংস্থাপনা ছাড়াও ঢাকা শহরের ক্রমবিকাশের সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে ভূমি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ। মোগল আমলে একটি সাধারণ রীতি এই ছিল যে, অধস্তন কর্মকর্তারা সদর দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁদের ওয়াকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। এভাবে সুবাদার, দিউয়ান, বখশি এবং ফৌজদার রাজদরবারে তাঁদের প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। অনুরূপভাবে ফৌজদার, কানুনগো ও আমীর সাধারণত প্রাদেশিক রাজধানীতে তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সুবাদার অথবা দিউয়ানের দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। একইভাবে এ রীতি জমিদারদের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাঁরাও তাঁদের ভূসম্পত্তির স্বার্থ দেখার জন্য রাজধানীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। দুর্বল অথবা ছোট জমিদারগণ, যাঁরা রাজধানীতে এককভাবে প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যয়ভার বহনে অপারগ ছিলেন, তাঁরা দুইজন, তিনজন অথবা চারজন মিলে একত্রে একজন নায়েবকে রাজধানীতে তাঁদের সকলের স্বার্থ দেখার জন্য নিয়োগ করতেন। সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদারগণ জমিদারী প্রশাসন নায়েবদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই রাজধানীতে বসবাস করতেন। ব্যবসায়ীরাও তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এ রীতি অনুসরণ করতেন। যেসকল বড় বড় ব্যবসায়ী রাজধানীতে বসবাস করতে সক্ষম, তাঁরা রাজধানীতে বাস করতেন। কিন্তু যেসকল বড় বড় ব্যবসায়ী রাজধানীর বাইরে ব্যবসা করতেন অথবা মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে রাজধানী ছেড়ে বাইরে যেতেন, তাঁরাও তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখাশুনার জন্য দরবারে প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোও একই উপায় অবলম্বন করে। অষ্টাদশ শতকে ঢাকায় ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানি তাদের নিজস্ব ফেক্টরিতে দ্রব্য উৎপাদন করতো। তারা সকলে দরবারে তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করতো, যাঁকে এজেন্ট, উকিল, নায়েব ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো।[৮] এই প্রতিনিধি প্রয়োজনের সময় কোম্পানির পক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দরবারে হাজির থাকতেন। শহরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনার সময় এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবদান স্মরণ রাখতে হবে।

ইসলাম খানের অধীনে শহরের প্রসার

ইসলাম খানের অধীনে ঢাকা শহরের প্রসার সম্পর্কে ধারণা আমরা মির্জা নাথনের লিখিত সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ *বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে* পাই। মির্জা নাথন লিখেছেন, যখন রাজকীয় সৈন্যবাহিনী এবং সুবাদার ইসলাম খান ঢাকার পথে শাহজাদপুর (পাবনা জেলায়) এসে পৌঁছেন, তখন সেখান থেকে ইসলাম খান তিনজন রাজকীয় কর্মকর্তাকে ঢাকায় কেল্লা

www.nagorikpathagar.org

তৈরির নির্দেশ দিয়ে ঢাকায় প্রেরণ করেন[৯] ১৬১০ সালের জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে মির্জা নাথন ও তাঁর পিতা ইহতিমাম খান ঢাকায় বেগ মুরাদ খানের দুটি কেল্লার (আধুনিক মিল ব্যারাক এলাকায় যেখানে দোলাই এবং বুড়িগঙ্গা মিলিত হয়েছে) নিকটে কোনো এক জায়গায় পৌঁছেন। ইসলাম খান তাঁদের কয়েকদিন আগে ঢাকায় পৌঁছেন এবং তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। ইসলাম খান বেগ মুরাদ খানের একটি দুর্গের দায়িত্ব মির্জা নাথনের উপর অর্পণ করেন এবং অপর দুর্গের দায়িত্ব ইহতিমাম খানের উপর অর্পণ করেন। মির্জা নাথন আরও লিখেছেন যে, ঢাকা শহর দোলাই নদীর তীরে অবস্থিত, যা ঢাকা পৌঁছার পূর্বে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা খিজিরপুরের নিকটে লক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং অন্য শাখা চার মাইল উজানে ডেমরার নিকটে একই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[১০] মির্জা নাথন, দ্বিতীয়বার ইসলাম খানের দুর্গে গমনের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, যাত্রাপথে তিনি একটি পাকুর গাছ দেখেছিলেন, যা নতুন ও পুরাতন ঢাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল এবং এ গাছটি ছিল তাঁর আবাসস্থল থেকে ইসলাম খানের দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে। এই পাকুর গাছ থেকে ইসলাম খানের বাসভবন (দুর্গ) পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে সৈন্যরা পাহারা দিত।[১১]

যে স্থানে পাকুর গাছের অবস্থান সনাক্ত করা হয়েছে, তা হলো আধুনিক বাবুবাজার এলাকার পাকুরতলী এবং ঢাকা দুর্গের অবস্থান হলো চকবাজারের বিপরীত দিকে আধুনিক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায়।[১২] সুতরাং নতুন ঢাকা হলো বাবুবাজার এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের মাঝামাঝি এলাকা এবং সম্ভবত পুরাতন ঢাকার পূর্ব সীমানা হলো পাটুয়াটুলী অথবা বড় দূর আধুনিক সদরঘাটের কাছাকাছি কোথাও। সম্ভবত মির্জা নাথনের বাসভবন এই এলাকার কোথাও ছিল। তাঁর উপর বেগ মুরাদ খানের একটি দুর্গের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। দুর্গের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায় যে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করতেন এবং এন. কে. ভট্টশালীও মনে করতেন যে, তাঁর বাসভবন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল।[১৩] কিন্তু মির্জা নাথনের বর্ণনায় জানা যায় যে পাকুর গাছ তাঁর বাসভবন এবং ইসলাম খানের বাসভবনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। এতে মনে হয়, তিনি পুরাতন ঢাকার পূর্ব সীমান্তে অন্য কোনো স্থানে বাস করতেন। নিম্নের আলোচনায় প্রতীয়মান হবে যে, বেগ মুরাদের দুর্গ পর্যন্ত শহর বিস্তৃত হয়েছিল আরও অনেক পরে। অধিকন্তু অন্য এক স্থানে মির্জা নাথন বলেছেন যে, তিনি নদীর তীরে নিজ প্রাসাদে বাস করতেন, যেখানে সাত দিনব্যাপী ভোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৪] এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মির্জা নাথনের বাসভবন বেগ মুরাদের দুর্গের পশ্চিম দিকে অন্য কোথাও অবস্থিত ছিল এবং সেই দুর্গ পর্যন্ত (মিল ব্যারাক এলাকা) শহর হয়তো তখনও বিস্তারলাভ করেনি।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম খানের সময় ঢাকা শহর পশ্চিমে চকবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাট পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল এবং পরবর্তীকালে মোগলদের আগমনের ফলে পশ্চিমার্ধে বসতি স্থাপিত হয়। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শহরটির বিস্তার নদীর তীরেই হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে উত্তর দিকে শহরের বিস্তার ঘটেছিল কিনা জানা যায় না। সম্ভবত চকবাজার থেকে উত্তর দিকে এবং পশ্চিম দিকে শহরের তখন সবেমাত্র পত্তন হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাজধানী হওয়ার কারণে শহরের সম্প্রসারণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যদিও ইসলাম খান এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন, তবু সম্ভবত তিনি শহর সম্প্রসারণের সময় পাননি। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের পর তিনি মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সেই তিন বছরেও স্বাধীন ভূঁইয়াদের দমনার্থে যুদ্ধে তিনি ব্যস্ত ছিলেন।[১৫] ঐ সময়ে বিদ্যমান কেবল দুর্গ এবং চাঁদনীঘাটের নাম পাওয়া যায়। প্রথমটি সুবাদার, *অন্যান্য* শাহী অফিসার এবং সৈনিকদের আবাসস্থল ছিল এবং কেল্লার বিপরীত দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চাঁদনীঘাটে রাজকীয় রণতরীসমূহ পরিদর্শন করা হতো এবং তা সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর উঠানামার স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। কেল্লার খুব কাছেই একটি বাজার স্থাপিত হয়, যা শহরে নবাগতদের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। যদিও সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থ *বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে* কোনো বাজারের উল্লেখ নেই, তবুও আমার বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী বাজার [১৬] নামে পরিচিত বর্তমান চকবাজার তখনকার দিনের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র ছিল, যদিও এর দোকানঘরগুলো অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল।[১৭] চকবাজারের সন্নিকটে কেল্লার পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেনাছাউনির বাজার হিসেবে পরিচিত উর্দু বাজারও একই উদ্দেশ্য সাধন করতো।

আজকের ঢাকায় ইসলামপুর রোড নামে একটিমাত্র রাস্তা এবং 'ইসলাম খান-কা মসজিদ' নামে একটি মসজিদ ইসলাম খানের নাম বহন করছে। আধুনিক লেখকদের বিশ্বাস, এ নামকরণ ঢাকার প্রথম নবাব ইসলাম খানের নামানুসারে হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[১৮] কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, মসজিদ এবং রাস্তা দুটিই মির্জা নাথনের বর্ণিত পুরাতন ঢাকায় অবস্থিত। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সত্যিই ইসলাম খান মসজিদটি নির্মাণ করে থাকেন, তাহলে কেন ইসলাম খান মসজিদটি তাঁর বাসভবন থেকে এত দূরে নির্মাণ করেছিলেন?

ঢাকায় ইসলাম খানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান এখনও দৃশ্যমান। তা হচ্ছে মালিটোলা-তাঁতিবাজারের কোণায় বুড়িগঙ্গা ও দোলাই খালের সংযোগখাল। ঘটনাক্রমে খননকৃত এ নতুন খাল দ্বারা মির্জা নাথনের বর্ণিত নতুন ঢাকা ও পুরাতন ঢাকা বিভক্ত হয়েছে এবং তা পাকুর গাছের (পুরাতন পাকুরতলী) নিকটে বুড়িগঙ্গা থেকে প্রবাহিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে কৌশলগত কারণেই খালটি খনন করা হয়েছিল ইসলাম খানের নতুন শহরকে রক্ষা করতে, যেমনটি এন. কে. ভট্টশালী ধারণা করেছিলেন অথবা খালটি খনন করা হয়েছিল সৈন্য এবং রণতরীসমূহ খুব দ্রুত চাঁদনীঘাট থেকে লক্ষ্যা নদীতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে, যে ব্যবস্থা সেই সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।

শহরের পরবর্তী সম্প্রসারণ

ইসলাম খানের অধীনে পশ্চিম চকবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাট পর্যন্ত শহরের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো। সৌভাগ্যক্রমে সপ্তদশ শতাব্দীর বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ এখন পাওয়া যায়। এই বিবরণের সময়কাল হচ্ছে ১৬৪০ হতে ১৬৮২ সাল। এখনো বিদ্যমান মোগল দালানসমূহের ধ্বংসাবশেষ ঢাকা শহরের ক্রমপ্রসার সম্পর্কে ধারণালাভ করতে সাহায্য করবে। ১৬৪০ সালে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ঢাকায় আগমন করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকা শহর একদিকে মনেশ্বর থেকে অন্যদিকে নারিন্দা ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত দেড় লীগেরও অধিক বিস্তৃত ছিল যা শহরের সম্প্রসারণ সুসম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছিল।[১৯] ম্যানরিকের

www.nagorikpathagar.org

উল্লখিত স্থানসমূহ শনাক্ত করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কারণ আজকের দিনেও এসব স্থান প্রায় একই নামেই বিদ্যমান রয়েছে। ম্যানরিকের বর্ণনা হতে এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম খানের পরে প্রায় সিকি শতাব্দীর মধ্যে ঢাকা শহর অতি দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল। মির্জা নাথনের বর্ণিত নতুন এবং পুরাতন শহর পশ্চিম দিকে প্রায় দ্বিগুণ প্রসারলাভ করে এবং মনেশ্বর ও হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্বদিকে শহরের বিস্তৃতি তত বেশি ছিল না। এ বিস্তৃতি ছিল মূলত কেবল পুরাতন ঢাকার সমান কিংবা তার চেয়েও কম। কিন্তু ম্যানরিকের বিবরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ফুলবাড়িয়া (আধুনিক ঢাকা রেলস্টেশন)[২০] পর্যন্ত শহরের উত্তরমুখী প্রসার। পশ্চিম দিকে শহরের দ্রুত প্রসার ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এই অংশটি ছিল মোগল সরকারি সংস্থাপনার সদর দফতর। সুতরাং এই সময়ে প্রধানত সরকারি প্রয়োজনে এবং উদ্যোগে শহর পশ্চিম দিকে দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমদিক পর্যন্ত ঢাকা শহরের শেষ সীমানা অন্তত উত্তর দিকে পরবর্তী কয়েক বছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। শহরের উত্তর সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং স্থলপথে শত্রুর আক্রমণ থেকে শহরকে রক্ষার জন্য মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩) একটি প্রবেশ দ্বার[২১] নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালে যা রমনা গেইট নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু আধুনিক হাইকোর্ট বিল্ডিং-এর পশ্চিমে স্থাপিত এ তোরণটি ১৯৬১ সালে আংশিকভাবে ধ্বংস করে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে মোগলরা তাদের স্থাপিত বসতির কেন্দ্রে দালান তৈরির কাজ শুরু করেছিল। শাহ সুজার দিউয়ান মীর আবুল কাসেম ১৬৪৫ সালে নদীর তীরে এবং চকবাজারের দক্ষিণে বড় কাটরা নির্মাণ করেন, যার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। এটি মূলত শাহজাদার বাসভবন হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু শাহজাদা তা পছন্দ করেনি বিধায় (অথবা তিনি রাজমহলে বাস করতেন বিধায়) তা দিউয়ানকে প্রদান করেন।[২২]পূর্ববর্তী সুবাদারগণ তাঁদের বাসভবন হিসেবে কোন প্রকার প্রাসাদ নির্মাণ না করেই কেল্লার মধ্যে বাস করতেন। কিন্তু সম্ভবত সুজা একজন শাহজাদা ছিলেন বলে তাঁর জন্য একটি নিজস্ব প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। মীর আবুল কাসেম পিলখানার উত্তরে সাতমসজিদ সড়কে প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটি ঈদগাহ (ঈদের নামাজ পড়ার স্থান) নির্মাণ করেন।[২৩] এই স্থানটি এখনও 'ঈদগাহ' নামে পরিচিত। সম্ভবত পিলখানা পর্যন্ত শহরের সীমানা স্থির থাকে এবং তার উত্তরের সমতল ভূমি হয়তোবা সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং রাজকীয় কর্মকর্তাদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বাগান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শাহ সুজার আমলে ১৬৪৯ সালে মুহাম্মদ বেগ নামক একজন রাজকর্মকর্তা কেল্লার নিকটে চুরীহাট্টায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[২৪] মুহাম্মদ মুকীম নামক নৌবাহিনীর একজন দারোগা চকবাজারের পূর্বদিকে একটি কাটরা নির্মাণ করেন। সেই কাটরাস্থল এখনও মুকীম কাটরা নামে পরিচিত, যদিও আজকের দিনে সেখানে কাটরার কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই।[২৫] ইসলাম খানের সময়কাল হতে ১৬৬৩ সালে মীর জুমলার মৃত্যু পর্যন্ত উল্লিখিত চারটি দালানই নির্মিত হয়েছিল।

ঢাকা শহরের আশেপাশে নির্মিত কতিপয় দালানের সাথে মীর জুমলার নাম জড়িত। তিনি শহর এবং শহরতলীকে মগ আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[২৬] স্থলপথে সৈন্য, খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত প্রেরণের জন্য তিনি ঢাকা এবং রাজধানী সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নির্মিত দুর্গসমূহের সংযোগ-সড়ক নির্মাণ করেন। একটি

www.nagorikpathagar.org

সড়ক দ্বারা (বর্তমানে ময়মনসিংহ সড়ক নামে পরিচিত) শহরের সাথে উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের সংযোগ রক্ষা করা হতো। টঙ্গী-জামালপুরে স্থাপিত দুর্গ দ্বারা এ সড়কের নিরাপত্তাবিধান করা হতো। টঙ্গীর সেতুও মীর জুমলা নির্মাণ করেছিলেন[২৭] অন্য একটি সড়ক শহরের সাথে ফতুল্লার (পুরাতন ধাপা) সংযোগ রক্ষা করতো, যেখানে দুটি দুর্গ বিদ্যমান ছিল এবং সেই সড়কটি খিজিরপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল, যেখানে আর একটি দুর্গ বিদ্যমান ছিল। ফতুল্লা সড়কের পাগলা সেতুও মীর জুমলা নির্মাণ করেন।[২৮] আজকের দিনে এই সড়কটি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক নামে পরিচিত।

ঢাকা শহরের স্বর্ণযুগ

শায়েস্তা খানের (১৬৬৩ সালে প্রথম নিয়োগ লাভ করেন) সময়ে সম্প্রসারণ ও নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তখন থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত ঢাকা সম্পর্কে আমরা বেশ কয়েকজন বিদেশী পরিব্রাজকের চাক্ষুষ বিবরণ পেয়েছি। এ যুগের প্রথম পরিব্রাজক হলেন মানুচি, যিনি ১৬৬৩ সালে ঢাকায় আগমন করেন। তিনি লিখেছেন, অনেক মানুষের বসতি থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহর তেমন বড় নয় এবং এখানে অধিকাংশ ঘরবাড়ি খড়ের তৈরি।[২৯] এর তিন বছর পরে ঢাকায় আসেন পরিব্রাজক টেভার্নিয়ার। তিনি লিখেছেন যে, ঢাকা শহর একটি বড় শহর, কিন্তু কেবল দৈর্ঘ্যে এর বিস্তার ঘটেছে, কারণ এখানে বহিরাগত সকলেই নদীর তীরে বাড়ি নির্মাণ করতে চেয়েছে। শহরের দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক দুই লীগ।[৩০] ১৬৬৯-৭৯ সালের দিকে থমাস বৌরী লিখেছেন যে, শহরটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তার অবস্থান নীচ জলাভূমির মধ্যে। শহরটির পরিধি ইংরেজি (৪০) চল্লিশ মাইলের কম ছিল না।[৩১]

দেখা যায় যে, ম্যানরিকের সময় থেকে বৌরীর সময় পর্যন্ত শহরটি চারিদিকে যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। মানুচির অস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী শহরটি বড় নয়, কিন্তু এখানে বসতি অনেক। উল্লিখিত অন্য দু'জন পরিব্রাজকের প্রামাণিক সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে এ বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেভার্নিয়ার এবং বৌরী উভয়ের মতে ঢাকা একটি বড় শহর ছিল এবং তাঁরা একমত যে, ঢাকা শহরে বিশাল জনবসতি ছিল। বৌরী আরও বলেন যে, ঢাকা শহর নিম্ন জলাভূমির মধ্যে অবস্থিত ছিল, যা পূর্বে আলোচিত নদ-নদী সংক্রান্ত বিবরণের সাথে সংগতিপূর্ণ।[৩২] ঢাকা শহরের প্রসারতা সম্পর্কে আরো উল্লেখ পাওয়া যায় ইংরেজদের দিউয়ানি প্রাপ্তির পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিলপত্রে। ১৭৮৬ সালে ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট শহরের সীমানা হিসেবে গ্রহণ করেন দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী-জামালপুর, পূর্বে পোস্তগোলা[৩৩] এবং পশ্চিমে মিরপুর।[৩৪] ১৮০০ সালে কোম্পানির ঢাকাস্থ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলর মোগল ঢাকার সীমানা নির্ধারণ করেছেন দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী, পশ্চিমে জাফরবাদ এবং পূর্বে পোস্তগোলা।[৩৫] থমাস বৌরী শহরের সীমানার কোনো বর্ণনা দেননি, কিন্তু তিনি ঢাকা শহরের আয়তন ইংরেজি চল্লিশ (৪০) মাইল বলে যে বক্তব্য দেন তা কোম্পানির দলিলপত্রের বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, শহরের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ যা হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঢাকা রাজধানী শহর হিসেবে তার মর্যাদা হারায়। তবে, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের কারণে মোগল রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত ঢাকার গুরুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কারণে পরে শহরের আরো সম্প্রসারণের তেমন কোনো প্রয়োজন আর থাকেনি।

অতএব মোগল ঢাকার দূরতম সীমানা হিসেবে ধার্য করা যেতে পারে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী, পশ্চিমে জাফরাবাদ-মিরপুর এবং পূর্বে পোস্তগোলা। শহরের আয়তন সম্পর্কিত এ তথ্য গ্রহণ করলে তার উত্তর ও দক্ষিণ অংশের তুলনামূলক গুরুত্বের ব্যাখ্যা অত্যাবশ্যক। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, শহরের উত্তরাংশে মীর জুমলা তোরণ (আধুনিক হাইকোর্ট বিল্ডিং) থেকে টঙ্গী পর্যন্ত জনবসতি ছিল বিরল। এর কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, সমগ্র মোগল আমলে, এমন কি কোম্পানি আমলের প্রথমদিকেও প্রশাসনিক সদর দফতর ছিল ইসলাম খানের কেল্লার অতি নিকটে। বাণিজ্যিক সদর দফতর শাহ্ বন্দর[৩৬] ছিল মিরপুরে। সুতরাং সকল গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাপনা ছিল নদীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম তীরে। দ্বিতীয়ত, টেভার্নিয়ারের সময়ে যখন শহরের সীমানা অনেক দূর সম্প্রসারিত হয়, তখন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, বেশির ভাগ মানুষ নদীর তীরে বসবাস করতে অত্যন্ত আগ্রহী। ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ, যারা তাদের প্রতিষ্ঠালগ্নে তেজগাঁওতে ফেক্টরি স্থাপন করেছিল, তারাও তাদের প্রধান কার্যালয় নদীর তীরে স্থানান্তরিত করে।[৩৭] তৃতীয়ত, বর্তমান বসতি এলাকার বেশির ভাগ পশ্চিম দিকে এবং অল্প কিছু অংশ পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখানে সেখানে বিরল জনবসতি ছাড়া উত্তর দিকের সমগ্র এলাকাটি বাগানে পরিপূর্ণ ছিল। ১৬৮৬ সালে উইলিয়াম হেজেস ঢাকা ভ্রমণকালে দেখেন যে, সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে আগত একজন নতুন দিউয়ান তাঁর আগমনের কিছুদিন পরেও একটি বাগানের তাঁবুতে বাস করতেন।[৩৮] ১৭৮০ সালে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে মীর জুমলা তোরণের উত্তর দিকের এলাকা বাগান ও গাছপালায় পরিপূর্ণ দেখা যায়।[৩৯] যদিও ইতোমধ্যে শহরের গুরুত্ব হ্রাস পায়, মানুষ শহর ছেড়ে চলে যায় এবং অনেক ঘর-বাড়ি খালি পড়ে থাকে, তবুও কয়েক বছর আগের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এত দ্রুত গাছপালায় আচ্ছাদিত হওয়ার কথা নয়। অবশেষে নিম্নে আলোচিত দালানসমূহে প্রতীয়মান হয় যে, মীর জুমলা তোরণের উত্তরাংশে কেবল একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, অধিকাংশ দালান নির্মিত হয়েছে দক্ষিণাংশে নদীর তীরে এবং কিছু সংখ্যক দালান নির্মিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সাত মসজিদ ও মিরপুরের দিকে।

এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায় ভবন নির্মাণ তৎপরতা। ইতিহাসে মহান নির্মাতা হিসেবে শায়েস্তা খানের নাম স্থান পেয়েছে। প্রথমে তিনি বাবু বাজারের নিকটে ইটের দেয়ালবেষ্টিত একটি কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যে প্রাসাদের অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু টেভার্নিয়ার সেই প্রাসাদ দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।[৪০] শায়েস্তা খান একই জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যা আজও বর্তমান।[৪১] কিন্তু শায়েস্তা খানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ১৬৬৩ সালে নির্মিত ছোট কাটরা এবং ১৬৭৬ সালে নির্মিত চকবাজার মসজিদ।[৪২] শাহজাদা আজম শাহ শায়েস্তা খানের পরে বাংলার সুবাদার হয়ে এসেছিলেন। তিনি লালবাগে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার প্রকৃত নাম ছিল আওরঙ্গাবাদ দুর্গ। আজকের দিনে এটি লালবাগের কেল্লা নামে পরিচিত। কিন্তু আজম শাহের আমলে এই কেল্লার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি।[৪৩] বর্তমানে এই দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে এবং এর কয়েকটি সিংহদ্বার মাত্র দেখা যায়। দুর্গের মধ্যে পরী

www.nagorikpathagar.org

বিবির মাজারের বিপরীত পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যা শায়েস্তা খানের নির্মিত বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।[৪৪] আজম শাহের আমলে প্রখ্যাত হুসেনী দালান নির্মিত হয়, যা পরবর্তীকালে শিয়া সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৫] এ সময়ে নির্মাণকার্য মিরপুরের দিকে উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। একই সময়ে নির্মিত আলাকুরী মসজিদ ও দারা বেগমের সমাধির নিকটে শায়েস্তা খান সাতগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪৬] মীর জুমলা তোরণের উত্তরে পাণ্ডু নদীর উপর খাজা আম্বর নামক জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ী একটি সেতু নির্মাণ করেন, যা খাজা আম্বর সেতু নামে পরিচিত। কিন্তু আজকের দিনে সেই সেতুর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া খাজা আম্বর আধুনিক কাওরান বাজারের নিকট একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।[৪৭] শায়েস্তা খানের শাসনের প্রথমদিকে একজন মুসলিম ব্যবসায়ী নারিন্দা সেতু নির্মাণ করেন এবং একই ব্যক্তি সেই এলাকায় একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।[৪৮] পর্যাপ্ত দালান নির্মাণের কাজ শায়েস্তা খানের শাসনামলে শুরু হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। শাহজাদা আজিম-উশ-শান লালবাগের কেল্লার দক্ষিণে পোস্তায় একখানা প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৪৯] করতলব খান (মুর্শিদকুলী খান) আধুনিক বেগম বাজারে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫০] ফররুখ সিয়র লালবাগের কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন[৫১] এবং খান মুহাম্মদ মৃধা লালবাগের কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় আতিশখানা নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫২]

নায়েব-নাযিমদের সময়কাল

সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, রাজধানী শহর হিসেবে মর্যাদা হারানোর পরই ঢাকার অবনতি ঘটে।[৫৩] একথা সত্য যে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থাপনাসমূহ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকা নায়েব-নাযিমদের আবাসস্থলে পরিণত হয় এবং ঢাকার নিয়াবত প্রদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ, বলা যায় আধুনিক বাংলাদেশের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করতো।[৫৪] এই সময়ে বণিক ও ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা, বিশেষত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের কর্মতৎপরতা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, ঢাকা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানি ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি পায়।[৫৫] অতএব রাজধানী স্থানান্তরের কারণে ঢাকা শহরের অবনতি হয়নি, যদিও এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিল। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, নির্মাণকার্য প্রায় বন্ধ হয়েছিল। তখন নায়েব-নাযিমগণ ইসলাম খানের কেল্লা বা দুর্গের মধ্যে বাস করতেন। কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর ইসলাম খানের কেল্লা ইংরেজ কর্মকর্তারা দখল করে নেয় এবং নায়েব-নাযিম বড় কাটরা প্রাসাদে চলে যান।[৫৬] নিমতলী প্রাসাদ (বর্তমান ঢাকা মিউজিয়ামের পাশে সেই প্রাসাদ আজ আর দেখা যায় না, কিন্তু এর ফটককক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের কার্যালয় অবস্থিত) নির্মিত হওয়ার পরে নায়েব-নাযিমগণ সেখানে চলে যান।[৫৭] এই সময়ের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলা যায়, ১৭২৮ সালে মির্জা লুৎফুল্লাহ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান) চকবাজার নির্মাণ করেন[৫৮] ১৭৩৫ সালে আরমানিটোলার মসজিদ নির্মিত হয়[৫৯] এবং কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর নিমতলী প্রাসাদ নির্মিত হয়।[৬০]

www.nagorikpathagar.org

জনপদ বিশ্লেষণ

শহরের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনার পরে এখন মোগল যুগে ঢাকার বিভিন্ন জনপদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পরিশিষ্ট–১ ও ২–এ বর্ণিত বিভিন্ন হাট–বাজার ও গঞ্জের নাম ১৭৯০–৯১ সালে কলকাতার বোর্ড অব রেভেনিউ–এর কাছে ঢাকার কালেক্টরের লিখিত পত্রে পাওয়া যায়। তবে পত্রগুলোতে ঢাকা শহরের সকল জনপদের নাম ছিল বলে আশা করা যায় না। কারণ যেসকল হাট–বাজার ও গঞ্জ লাখেরাজ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলোর নাম এবং মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের এবং তাদের দোকানের নামই কালেক্টর সরবরাহ করেন। এসকল নাম, রেনেলের মানচিত্রে লিপিবদ্ধ নাম এবং আধুনিক ঢাকা শহরে বিদ্যমান অথচ মোগল যুগেও বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায় এমন সব নাম সমন্বিত করে শহরের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব। যদিও এতে মোগল শহরের সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হবে না, তবুও তা আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম করবে। নামসমূহ নিম্নরূপে সাজানো যেতে পারে :

'ক' গ্রুপ	'খ' গ্রুপ	'গ' গ্রুপ	'ঘ' গ্রুপ
মির্জা নাথনের পুরাতন ঢাকা এবং পূর্বদিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	ইসলাম খানের রাজধানী এবং পশ্চিম দিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	মীর জুমলা তোরণের উত্তর দিকে তেজগাঁও ও টঙ্গীর দিকের এলাকাসমূহ	অশনাক্তকৃত স্থানসমূহ স্থানসমূহ
১. কলতাবাজার	১. চকবাজার	১. বাজার ধনকোরয়া	১. আবে আবু সাঈদ
২. বাংলাবাজার	২. মনোহর খান বাজার (মুনওয়ার খান বাজার)	২. ফেগুগঞ্জ	২. ডুরীধুণ্ডা
৩. গোবিন্দগঞ্জ (দয়াগঞ্জ)	৩. কেল্লিয়া বাজার (কিল্লাবাজার, লালবাগ)	৩. তেজগঞ্জ তেজগাঁও	৩. মুরাদ ঝিন্দা
৪. মোহনগঞ্জ	৪. বংশীবাজার	৪. ওলন্দাজ দেওরী	৪. লস্কর বুরদা
৫. পাটুয়াটুলী	৫. বকশীবাজার	৫. মানিক চাঁন্দ গার্ডেন	৫. আখেরী জুমা
৬. সূত্রাপুর	৬. দেওয়ান বাজার	৬. বেকুন গার্ডেন	৬. বাকীতুলাহ
৭. নারায়িনদিয়া (নারিন্দা বা নারায়ণদিয়া)	৭. বাজার মীর মুরাদ	৭. বোস গার্ডেন	৭. দেওরী মীর জুমলা

www.nagorikpathagar.org

'ক' গ্রুপ	'খ' গ্রুপ	'গ' গ্রুপ	'ঘ' গ্রুপ
মির্জা নাথনের পুরাতন ঢাকা এবং পূর্বদিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	ইসলাম খানের রাজধানী এবং পশ্চিম দিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	মীর জুমলা তোরণের উত্তর দিকে তেজগাঁও ও টঙ্গীর দিকের এলাকাসমূহ	অশনাক্তকৃত স্থানসমূহ স্থানসমূহ
৯. তাঁতিবাজার	৯. এনায়েতগঞ্জ	৯. ফ্রেন্স গার্ডেন	৯. গানওয়ারটুলী
১০. ঝালুয়ানগর	১০. সুলতানগঞ্জ	১০. ইংলিশ গার্ডেন	১০. এভিলিনবাজার
১১. বানিয়ানগর	১১. রহমতগঞ্জ		১১. ফোর্ডগঞ্জ
১২. গোয়ালনগর	১২. বুরানগঞ্জ		
১৩. শাঁখারিবাজার	১৩. বুরহানগঞ্জ চাঁদনীঘাট		
১৪. কামারনগর	১৪. সোয়ারীঘাট		
১৫. কুমারতলী	১৫. ইসলামপুর		
১৬. রায়সাহেব বাজার	১৬. নবাবপুর		
১৭. লক্ষিবাজার	১৭. নিমতলী		
১৮. ফ্রেন্সগঞ্জ (ফরাশগঞ্জ)	১৮. ঢাকেশ্বরী		
১৯. আলমগঞ্জ	১৯ লালবাগ		
২০ পোস্তগোলা (পোস্তকিলা)	২০. পূর্ব দরওয়াজা (ইসলাম খানের কেল্লার পূর্ব ফটক) আধুনিক কেন্দ্রীয় কারাগার		
	২১. ফুলবাড়িয়া		
	২২. ফুলমান্দি		
	২৩. আজিমপুর		

www.nagorikpathagar.org

'ক' গ্রুপ মির্জা নাথনের পুরাতন ঢাকা এবং পূর্বদিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	'খ' গ্রুপ ইসলাম খানের রাজধানী এবং পশ্চিম দিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ	'গ' গ্রুপ মীর জুমলা তোরণের উত্তর দিকে তেজগাঁও ও টঙ্গীর দিকের এলাকাসমূহ	'ঘ' গ্রুপ অশনাক্তকৃত স্থানসমূহ স্থানসমূহ
	২৬. নবাবগঞ্জ ২৭. নবাববাগিচা ২৮. হাজারীবাগ ২৯. জাফরাবাদ ৩০. আতিশখানা ৩১. মোগলটুলী ৩২. চৌধুরী বাজার ৩৩. ইমামগঞ্জ ৩৪. মালীটোলা ৩৫. মাহুতটুলী ৩৬. কায়েতটুলী ৩৭. পিলখানা ৩৮. মিরপুর		

উল্লিখিত নামসমূহের মধ্যে কিছু বাজারের উৎপত্তি হয়েছে ইংরেজ আমলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঢাকার কালেক্টর তাঁর পত্রে লিখেছেন যে রায় সাহেব বাজার, লক্ষ্মীবাজার ও ইমামগঞ্জ কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ কোম্পানির আদি দলিলপত্রে দেখা যায় যে, এভিলিন এবং ফোর্ড উভয়েই ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফেন্সগঞ্জের (আধুনিক ফরাশগঞ্জ ফ্রেন্সগঞ্জের বিকৃত রূপ,) উৎপত্তি কিভাবে হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে ঢাকায় তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং ফরাসী কোম্পানি এ গঞ্জটি হয়তো মোগল আমলের শেষ দিকে অথবা বৃটিশ আমলের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠা করেছিল। খুব সম্ভবত চৌধুরীবাজার ব্রিটিশ আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ চৌধুরী উপাধিধারী জমিদারগণ ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে খুবই প্রভাবশালী ছিলেন।[৬৪] উল্লিখিত স্থানগুলো ছাড়া বাকি স্থানগুলো মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর বিশ্লেষণ করলে চমৎকার ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

'খ' গ্রুপে উল্লিখিত স্থানসমূহের অবস্থান পূর্বে বাবুবাজারস্থ (পাকুরতলী বা মির্জা নাথনের পাকুর গাছ) ইসলাম খানের খাল থেকে পশ্চিমে জাফরাবাদ, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা ও পিলখানা

www.nagorikpathagar.org

এবং উত্তরে মীর জুমলা তোরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ১৮নং স্থান ছাড়া বাকি স্থানগুলোর উৎপত্তি হয়েছে মোগল আমলে। শব্দের শেষে সংযুক্ত বাজার, গঞ্জ, বাগ, বাগিচা, টালী, টুলী, পুরা, মণ্ডি ও খানা মোগল যা মুসলিম আমলে উৎপত্তির ইঙ্গিত বহন করে। দুটি ঘাটের সঙ্গে চাঁদনী এবং সোয়ারী শব্দ যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, মোগল আমলে এদের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং এ নামসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পরে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের কারণে অথবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে এ সকল স্থান মোগলদের দ্বারা সম্প্রসারিত এবং বিকশিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ১৮ সংখ্যক স্থানটির উৎপত্তি প্রাক মোগল আমলে হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। 'ক' গ্রুপে বর্ণিত স্থানসমূহের অবস্থান ছিল শহরের পূর্বসীমানা এবং মির্জা নাথনের বর্ণিত পুরাতন ঢাকার মধ্যে। এই গ্রুপে ৮, ১৯, ও ২০ নং স্থান ছাড়া বাকি স্থানগুলো অমুসলিম বা অমোগল জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত এবং অধিকাংশ স্থান হিন্দু পেশাজীবী এবং শিল্পীশ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন—টুয়া, সুতার, তাঁতি, জেলে, বানিয়া, গোয়ালা, শাঁখারি, কামার ও কুমার। কিন্তু একই সাথে এসকল স্থানের নামের শেষে বাজার, গঞ্জ, পুর, তলী, টালী, টুলী ও নগর শব্দ সংযুক্ত হয়েছে। শেষের সংযোজন ছাড়া বাকি সব সংযোজন মুসলিম যুগে এসব স্থানের উৎপত্তির প্রমাণ বহন করে। শেষের সংযোজনা বিশিষ্ট স্থানের উৎপত্তিও খুব সম্ভবত শহর হিসেবে ঢাকার বিকাশের পরেই হয়েছে। অতএব এই গ্রুপের স্থানের নামের বিশ্লেষণ একথা প্রমাণ করে যে, মোগল আমলে যখন শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় কেবল তখনই পেশাজীবী এবং শিল্পীশ্রেণী এই সকল স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। খুব সম্ভবত ঢাকায় মোগল থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাণিজ্যিক স্বার্থে এসকল লোক ঢাকায় আসতে শুরু করে। কিন্তু ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর বিপুল সংখ্যায় তাদের আগমন ঘটে। তা হলেও একথা বলা যায় যে, ঢাকায় মোগল থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই এলাকায় জনবসতি ছিল না। তবে একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পরেই এখানকার জনপদগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এককরূপে গড়ে ওঠে এবং এগুলোর জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কারা ঢাকার আদি বাসিন্দা এবং মোগল আমলের পূর্বে কোন স্থানের নাম কি ছিল তা সম্ভবত এখন আর জানা সম্ভব হবে না। যাই হোক, 'ক' গ্রুপভুক্ত স্থানগুলোর নামের মধ্যে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পেশাজীবী ও শিল্পীশ্রেণীর লোকের পেশা অনুসারেই এসব স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। এরা এসব স্থানে বসতি স্থাপন করে নিজ নিজ পেশা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করতো এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসা করতো। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এসব স্থানের নাম কেমন ছিল নারিন্দা (নারায়ণদিয়া) নামক স্থানের নাম থেকে তার সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজকের দিনে নারিন্দা একটি ক্ষুদ্র এলাকা। কিন্তু মোগলদের আগমনের পূর্বে এবং সম্ভবত সমগ্র মোগল আমলে নারিন্দা পূর্বে দয়াগঞ্জ থেকে পশ্চিমে বর্তমান ভিক্টোরিয়া পার্ক সম্প্রসারিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে ভিক্টোরিয়া পার্কের নিকটে (আধুনিক স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং এর কাছে)[৬৪] একটি ফেক্টরি স্থাপন করে এ স্থানটিকে নারিন্দা (নারায়ণদিয়া) বলে

www.nagorikpathagar.org

অভিহিত করে।[৬৫] আজকের দিনে এই এলাকা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষ্মীবাজার, নারিন্দা, দয়াগঞ্জ এবং এই এলাকায় বহু রাস্তা, গলি ও শাখা-গলি রয়েছে।

যখন ঢাকা রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এখানে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রসার লাভ করে, তখন বিদেশী ব্যবসায়ীগণ ঢাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন মোগল, পাঠান, আর্মেনীয় ও পশ্চিম ভারতীয় হিন্দু ব্যবসায়ীগণ। ঢাকায় আসার পর তাদের প্রয়োজন হয় বাসস্থানের। ব্যবসায়ী হিসেবে সম্ভবত তারা বাণিজ্যকেন্দ্রের আশেপাশে তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এর ফলে পশ্চিমে মিরপুরের দিকে যেখানে শাহবন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল অথবা পূর্ব দিকে যেখানে পেশাজীবী ও শিল্পীশ্রেণী বসবাস করতো, সেখানে তারা তাদের বসতি স্থাপন করে। উভয় এলাকা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অতএব তাদের আবাসিক এলাকা পূর্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকেই গড়ে ওঠে। 'ক' গ্রুপের ৮নং এবং 'খ' গ্রুপের ১৫, ১৮, ২১, ২৩, ২৮, ২৯, ও ৩১ নং প্রভৃতি এলাকার নাম থেকেই বোঝা যায়, এগুলো ব্যবসায়ী ও বণিকদের আবাসিক এলাকা। 'ঘ' গ্রুপের ১-৯নং এলাকার স্থানিক পরিচয় সঠিকভাবে জানা না গেলেও এগুলো আবাসিক পরিচয় তুলে ধরে। 'দেওরী' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাসাদ এবং যেসব স্থানে প্রাসাদ ছিল, সেগুলো ওখানকার প্রাসাদসমূহের মালিকদের নাম অনুসারে নাম ধারণ করে। বেচারাম দেওরী এখনো বিদ্যমান। যেসকল নামের শেষাংশে 'জুমাল' আছে সেসকল নামও কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত। সুতরাং এসকল স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল মূলত ব্যবসায়ী ও বণিকশ্রেণীর কর্মতৎপরতার ফলেই। আজও আরমানিটোলা ঢাকায় আর্মেনীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে। তাদের পরে আসে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ। একথা সুপরিজ্ঞাত যে, ইউরোপীয়গণ প্রথমে তাদের বাণিজ্যিক কুঠি তেজগাঁওতে স্থাপন করে।[৬৬] ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বেই এ এলাকায় দ্রুত বসতি স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয়দের আগমনের সাথে সাথে এই এলাকার প্রতি অন্যান্য বণিকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তাদের সদর দফতর নদীর তীরে স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও তাদের পণ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করে হুগলী নদীর তীরে তাদের প্রধান কেন্দ্রে প্রেরণের কর্মকেন্দ্র তেজগাঁওতে থেকে যায়।[৬৭] অতএব 'গ' গ্রুপভুক্ত বসতিসমূহ মূলত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের উদ্যোগের ফলেই স্থাপিত হয়।

উপরের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে যে, ঢাকা শহরের প্রসারের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অবদান রেখেছিল। এগুলো হচ্ছে- (ক) মোগল প্রশাসকগণ এবং তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনসমূহ, (খ) বাঙালি পেশাজীবী, মিস্ত্রি ও কারিগর শ্রেণী এবং (গ) ইউরোপীয় কোম্পানিসহ বিদেশী বণিকশ্রেণী। প্রত্যেক গ্রুপের অবদান নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায় :

পুরাতন ঢাকার অবস্থান পশ্চিমে বাবুবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাটের মধ্যে। মোগল থানা প্রতিষ্ঠার কারণে এ স্থানটি শহরে পরিণত হয়। এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মোগল প্রশাসকগণ বাবুবাজার থেকে পশ্চিম দিকে শহর সম্প্রসারিত করে। অন্যদিকে শহরের বিকাশমান গুরুত্বের কারণে শিল্পী, মিস্ত্রি, কারিগর ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর দৃষ্টি শহরের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা পূর্বদিকে শহরের সম্প্রসারণ ঘটায়। এর পরে মোগল, পাঠান, আর্মেনীয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে। তারা ঢাকার দুটি অংশেই বসতি স্থাপন

www.nagorikpathagar.org

করে এবং উন্নয়ন সাধন করে। ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে তেজগাঁও এলাকায় জনবসতি গড়ে ওঠে এবং এর ফলে শহরের প্রসার চূড়ান্ত হয়।

উপরে বিভিন্ন সময়ে শহরের প্রসারের যে বিবরণ দেওয়া হলো তাতেই এখানে বিভিন্ন বসতি এলাকা গড়ে উঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা

১. *Journal of the Asiatic of Bengal,* ভল্যুম-৬, এন. এস. ১৯৯০ পৃ. ১৪১-১৪৩।

২. এ এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ১৭, *বি.পি.পি.* ভল্যুম-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৪৯।

৩. এস. আহমদ, *Inscriptions of Bengal,* ভল্যুম-৪, পৃ. ৭১।

৪. *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম ৬, এন.এস. ১৯১০, পৃ. ১৪৪।

৫. *আইন,* পৃ. ১৫১।

৬. *আকবরনামা,* ভল্যুম-৩ (বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত) পৃ. ১২, ১৩-১৫, ১২৩৬।

৭. এ দুর্গটিকে ঢাকার আধুনিক কেন্দ্রীয় কারাগার বলে সনাক্ত করা হয়েছে। পরে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর ইংরেজ দলিলদস্তাবেজে তাদের বিভিন্ন স্বার্থ দেখার জন্য বহু প্রতিনিধি নিয়োগের অসংখ্য উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। পূর্বকালের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ইসলাম খানের আগ্রায় প্রতিনিধি নিয়োগ (*বাহরিস্তান*-১ পৃ. ২১১) ; ১৭০২ সালে জমিদার, কানুনগো ও ব্যবসায়ীদের দিউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সাথে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আগমন (*তারীখ এফ*-২৮ এ. বি ও ২৯.এ) ; মুর্শিদকুলী খান এবং হুগলীর ফৌজদার জিয়াউদ্দিন খান কর্তৃক রাজদরবারে প্রতিনিধি নিয়োগ (তুলনীয় বি.পি.সি., ২৭শে মার্চ, ১৭১৩) এবং বুলচান্দ নামক একজন কাস্টম কর্মকর্তাকে ঢাকায় শায়েস্তা খানের দরবারে প্রতিনিধি নিয়োগ (*The Diary of William Hedges,* এইচ. ইউল কর্তৃক সম্পাদিত ভল্যুম-১, পৃ. ৫৩)। ইউরোপীয় কোম্পানি কর্তৃক সুবাদার ও দিউয়ানের দরবারে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের অসংখ্য উদাহরণও আছে (দ্রঃ আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and llis Times,* চতুর্থ অধ্যায়)।

৯. *বাহরিস্তান*-১, পৃ. ৫৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১২. *বি.পি.পি.*, ভল্যুম-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৫০-৫৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১৪. *বাহরিস্তান-১, পৃ. ২১৫-২১৭।*

www.nagorikpathagar.org

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০, ২৭০।

১৬. এস.এম. তাইফুর, *Glimses of old Dhaka,* পৃ. ৪১।

১৭. এটি ঢাকার নায়েব-নাযিম (১৭২৮-১৭৩৪) মির্জা লুৎফুল্লাহ (যাঁর উপাধি ছিল দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ্গ) কর্তৃক নির্মিত হয়। দেখুন, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭ ন ; -২ পৃ. ৩০০-৩০১।

১৮. এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ২০৩; এস.এম. তাইফুর, *Glimses of old Dhaka* পৃ. ৪২।

১৯. *B.P.P,* ভল্যুম-৫১, ১৯৩৬, পৃ. ৫২।

২০. *Travels of Sebastian Manrique,* লুয়ার্ড এন্ড হোস্টেন কর্তৃক অনূদিত, ভল্যুম-১, পৃ. ৪৩-৪৪।

২০. বর্তমানে এখানে রেলস্টেশন নেই। রেললাইনও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। রেলস্টেশন ফুলবাড়িয়া থেকে স্থানান্তর করে বর্তমান কমলাপুরে স্থাপন করা হয়েছে।

২১. এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ৪।

২২. *Journal of the Asiatic of Pakistan,* ভল্যুম-৭, নং-২, পৃ. ৩০২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

২৪. এ.এইচ.দামী, *Dacca,* পৃ. ১৯০।

২৫. *Journal of the Asiatic of Pakistan,* ভল্যুম-৭, সংখ্যা-২, পৃ.৩০০।

২৬. এ.এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ৪, ৩৩, ৪৬।

২৭. এস.এম. তাইফুর, *Glimses of old Dhaka,* পৃ. ৭৯।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৮।

২৯. মানুচি, *Storia do Mogor,* উইলিয়াম অরভিন অনূদিত, ভল্যুম-২, পৃ. ৮৬।

৩০. টেভার্নিয়ার, *Travels in India* পৃ.-১০০।

৩১. থমাস বৌরী, *A Geographical Account of the Countries Round the Bay of Bengal,* পৃ. ১৪৯-৫১।

৩২. প্রথম অধ্যায় দেখুন।

৩৩. মূলত শব্দটি 'পুশত কিলা' অর্থাৎ দুর্গের পেছনের দিক, যা বিকৃত হয়ে পোস্তগোলা হয়েছে। এ নামটি আজকের দিনেও আছে এবং তা শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

৩৪. India Office Records, *Proceedings of the Board of Revenue,* ৮ জুন, ১৭৮৭, নং ১৩।

৩৫. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, সংখ্যা-২, পৃ. ৩৪১।

৩৬. শাহ বন্দর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

৩৭. পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

৩৮. *The Diary of William Hedges,* এফ, ইউল কর্তৃক অনূদিত, ভল্যুম-১, পৃ. ৫১।

৩৯. রেনেলের মানচিত্র নং ১২।

www.nagorikpathagar.org

৪০. টেভার্নিয়ার, *Travels in India,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ডব্লিও, ক্রুক, পৃ. ১৩৫।

৪১. এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ২০২।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৪৪. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, নং-২, পৃ. ৩৩১।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৪৬. এ.এইচ. দানী, Dacca, পৃ. ২১৬-২১৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

৪৯. *Topography,* পৃ. ৯৬।

৫০. এ.এইচ. দানী, Dacca, পৃ. ১৬১।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৫৪. চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

৫৫. পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

৫৬. ব্রাডলি বার্ট, *Romance of an Eastern Capital,* পৃ. ২২০ ; এ.এইচ. দানী, Dacca, পৃ. ২০১।

৫৭. ডয়লী এবং বিশপ হেবার উভয়ে এ স্থানের উল্লেখ করেছেন। দেখুন, চার্লস ডয়লী, *Antiquities of Dacca,* পৃ. ১৮ ; বিশপ হেবার, *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India,* ভল্যুম-১, পৃ. ১৪০-১৪২।

৫৮. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, নং ২, পৃ. ৩০০-৩০১।

৫৯. এ, এইচ দানী, *Dacca,* পৃ. ১৯৫।

৬০. মানিক চাঁদ ছিলেন মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে প্রখ্যাত ব্যাংকার। ১৭১৪ সালে তিনি মারা গেলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ্ চাঁদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং এই ফতেহ চাঁদই সর্বপ্রথম জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, B.P.P., ভল্যুম-২০ এবং ২২। আরও দেখুন, আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His Times,* পৃ. ৯৮-৯৯।

৬১. বেকুন একজন ব্যবসায়ী, যিনি কোম্পানির শাসনের সূচনালগ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৬২. পরিশিষ্ট-১ দেখুন।

৬৩. তুলনীয়, *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-৪।

৬৪. বর্তমানে এখানে আর State Bank of Pakistan বিদ্যমান নেই। তা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মতিঝিলে স্থানান্তরিত হয়েছে। State Bank of

www.nagorikpathagar.org

Pakistan বিল্ডিং বর্তমানে Institute of Bank Management নামক প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়।

৬৫. *B.P.C.,* ৪ঠা মার্চ, ১৭২৮।

৬৬. *B.P.P.,* ভল্যুম-৩৩, ১৯২৭, পৃ. ১৯-৩৩ ; *The Diary of William Hedges,* ভল্যুম-১, পৃ. ৪৪।

৬৭. তুলনীয়, *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২ ; *Consultation,* ১৬ই ডিসেম্বর ১৭৩৭।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়
প্রশাসনিক সদর দফতর হিসেবে ঢাকা

মোগল প্রাদেশিক প্রশাসন

প্রাকমোগল যুগের অখ্যাত স্থান ঢাকা পরে মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম ও সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশের প্রশাসনিক সদর দফতরে পরিণত হয়। নতুন রাজধানী হিসেবে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব মূল্যায়ন করতে হলে মোগল প্রাদেশিক প্রশাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। *আইন-ই-আকবরী* এবং *আকবরনামা* উভয় গ্রন্থে প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপাধি বা পদবি এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ আছে। প্রদেশের (মোগল সুবার) প্রধান ব্যক্তি ছিলেন গভর্নর, যাঁকে আকবরের আমলে 'সিপাহসালার', জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে 'সুবাদার' বা 'নাযিম' বলা হতো। কিন্তু আওরঙ্গজেব ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে নযিমরূপেই তাঁরা বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তাঁদের স্থানীয় পদবি ছিল নবাব। ইংরেজদের প্রাথমিক দলিলপত্রে এবং বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাঁদেরকে নবাব উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন কি যখন ঢাকা নিয়াবতের কর্মকেন্দ্র হয়, তখনও নায়েব-নাযিমের নবাব উপাধি প্রচলিত ছিল। প্রদেশের সুবাদার ছিলেন কেন্দ্রের সার্বভৌম শাসক বা সম্রাটের প্রতিনিধি এবং তিনি ছিলেন প্রদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি প্রতিরক্ষা, ফৌজদারি বিচার ও সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। সুবাদারের অধস্তন কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান, যিনি সকল অবস্থায় সুবাদারের অধীন ছিলেন না এবং তিনি কেন্দ্র থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে রাজস্ব এবং দিউয়ানি বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন।[১] মূলত এ দুইজন কর্মকর্তা প্রদেশের সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে পালন করতেন। তাঁরা তাঁদের অধীনে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা সহকারী হিসেবে নিয়োগ করতেন। তাঁরা হলেন বখ্‌শি (সৈন্যবিভাগের কর্তা), সদর (দান, অনুদান ও ধর্মীয় বিভাগের প্রধান), কাজী (বিচারক), কোতোয়াল (শহরপুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট), মীর-ই-বহর (এডমিরাল বা নৌ-সেনাধ্যক্ষ), আমীল বা আমলগুজার (রাজস্ব সংগ্রহকারী) ও কানুনগো (শাব্দিক অর্থ হল আইন ব্যাখ্যাকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ভূমি রাজস্ব রেজিস্টাররক্ষক)। প্রত্যেক প্রদেশ কিছু সংখ্যক সরকার এবং মহাল বা পরগনায় বিভক্ত ছিল। সরকার ছিল প্রশাসনিক এবং রাজস্বের একক। প্রত্যেক সরকারের নির্বাহী প্রধান ছিলেন ফৌজদার এবং রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন আমীল (আমলগুজার বা বিতিক্‌চি)। প্রত্যেক পরগনার নির্বাহী প্রধান ছিলেন আমীল শিকদার এবং রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ছিলেন আমিন। প্রত্যেক পরগনায় কানুনগো এবং পাটোয়ারী (লিখক বা কেরানী) যুক্তভাবে রাজস্ব প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর পরিচালনা করতেন।[২]

www.nagorikpathagar.org

সুবাদারি সংস্থাপনা

উল্লেখ করা যায় যে, রাজধানীতে সুবাদার, দিউয়ান, বখ্‌শি, সদর, কাজী, মীর-ই-বহরও ওয়াকিয়ানবিশের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়। কোতোয়াল তাঁর দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজধানীর মধ্যে তাঁর বিভাগ পরিচালনা করতেন। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুবাদারের দপ্তর। এই দপ্তরে সুবাদার বখ্‌শি ও মীর-ই-বহরের সহায়তা নিয়ে কাজ করতেন। তাঁরা মোগল বাহিনী তথা পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, হস্তীবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বাংলা প্রদেশ। সম্পর্কে লিখেছেন যে এখানে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য অবস্থান করতো।[৩] এ সংখ্যা সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে, কারণ মোগল যুগে এ রকম নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। মোগলরা মনসবদারদের মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করতো। একই সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ অবান্তরও বলা যায় না। তিনি সম্ভবত তাঁর সামরিক সংস্থাপনার একটি সাদামাঠা বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে আমরা তাঁর আমলে বাংলার মোগল সামরিক ও বেসামরিক সংস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। শান্তির সময় সুবাদারের সমগ্র সংস্থাপনা রাজধানীতেই কেন্দ্রীভূত থাকতো। ফৌজদারের মতো স্থানীয় কর্মকর্তারা নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকতেন। যাই হোক, যুদ্ধের সময় সকল সৈন্য ও কর্মকর্তাকে উপদ্রুত এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু যুদ্ধের সময় হোক অথবা শান্তির সময় হোক, সব সময়ে রাজধানীর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। রাজধানী ছিল সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনা, দেশে শান্তিরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। রাজধানী থেকেই সুবাদার সমগ্র প্রদেশ শাসন করতেন এবং সাম্রাজ্যের সকল স্বার্থের প্রতি নজর রাখতেন। বিদ্রোহী জমিদার, সড়ক-মহাসড়কের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী চোর-ডাকাত এবং পরাজিত শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার বিচারের জন্য এখানে আনা হতো।

বাংলার প্রায় সকল মোগল সুবাদার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন।[৪] সুতরাং ঢাকা রাজধানী এবং বিভিন্ন অভিযানের ভিত্তি হিসেবে মোগল ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঢাকার প্রথম নবাব ইসলাম খান তাঁর সুবাদারির সমগ্র সময়কাল স্বাধীন ভূঁইয়াদের দমনেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী কাসিম খান শুধু ভূঁইয়া ও বিদ্রোহী প্রধানদের দমনেই ব্যস্ত ছিলেন না, তিনি মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন এবং সীমান্তবর্তী রাজ্য কামরূপ ও কাছাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ আরাকান ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং হিজলির বিদ্রোহী জমিদারকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ খুররমের (পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং সেই যুদ্ধে প্রাণ হারান। শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবাদার কাসিম খান হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। ইসলাম খান মাশহাদি অহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কামরূপ পুনর্দখল করেন এবং চট্টগ্রাম সীমান্তে মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শাহ সুজার সুবাদারিকালে তিনি নিজে রাজমহলে অবস্থান করতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি আবুল কাসেম ঢাকায় অবস্থান করে এই এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে প্রথম সুবাদার মীর জুমলা কুচবিহার ও আসাম জয় করেন এবং

www.nagorikpathagar.org

শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করেন। উভয় ক্ষেত্রে অভিযান প্রেরণের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢাকা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ঢাকা নায়েব-নাযিমের সদর দফতরে পরিণত হয়, তখন মির্জা লুৎফল্লাহ ১৭২৮ সালে ত্রিপুরা জয় করেন।[৫] অতএব প্রশাসনিক নির্বাহী ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ঢাকার গুরুত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

দিউয়ানি সংস্থাপনা[৬]

সুবাদারের সংস্থাপনার সদর দফতর হিসেবে ঢাকা যদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, বেসামরিক বা দিউয়ানি প্রশাসনকেন্দ্র হিসেবে ঢাকা যে ভূমিকা পালন করেছিল তা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে রাজধানীর এ ভূমিকা পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। দিউয়ানের দফতর এবং তাঁর রাজস্ব প্রশাসনের মাধ্যমেই সরকার জনগণের সংস্পর্শে আসে। সংক্ষেপে দিউয়ানের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ :

সুলতানি আমলে দিউয়ান বলতে একটি বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে বুঝাতো।[৭] তখনকার দিনে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে একজন কর্মকর্তা ছিলেন, যার উপাধি ছিল *সাহিব-ই-দীউয়ান* বা *খাজা*।[৮] সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 'দিউয়ান' বলতে যে ব্যক্তিকে বুঝানো হতো কার্যত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজস্বমন্ত্রী এবং তখন দিউয়ানি বলতে মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বুঝানো হতো না। তখন রাজস্ব মন্ত্রণালয়ই দীউয়ানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং অন্য কোনো বিভাগের এ পরিচিতি ছিল না।[৯] সম্ভবত এই সময়ে প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা দিউয়ান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এক্ষেত্রে আকবরের রাজত্বের ৪০তম বর্ষে আর একটি পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা এই যে, আকবর প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা বা দিউয়ানকে প্রাদেশিক সুবাদার বা প্রশাসনিক শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করেন।[১০] আওরঙ্গজেবের সময়কালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা (সুবাদার বা নাযিম) ও প্রাদেশিক দিউয়ান এ দুই কর্মকর্তার কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁদের দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় এবং তাঁরা উভয়ে সময়ে সময়ে সম্রাট কর্তৃক ইস্যুকৃত রাজকীয় ফরমানদিবা *দস্তুর-উল-আলম* দ্বারা পরিচালিত হতেন। এ প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ লিখেছেন যে, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং রাজকীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় সামগ্রিকভাবে প্রাদেশিক দিউয়ানের অধিক্ষেত্রভুক্ত হয়। তখন নাযিমের (সুবাদারের) অধিক্ষেত্রভুক্ত ছিল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন এবং তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, অবাধ্য ও উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করা। নিযামতের সাথে সংযুক্ত জাগীরসমূহ, ব্যক্তিগত মনসব এবং উপহারসামগ্রী ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে রাজকীয় রাজস্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতা নাযিমের ছিল না।[১১] আওরঙ্গজেব কর্তৃক ইস্যুকৃত ফরমানে প্রাদেশিক দিউয়ানের বর্ধিত দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ :

দিউয়ান খালিসা মহল (সংরক্ষিত বা কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি)-এর রাজস্ব সংগ্রহ করবেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন, প্রদেশের সকল কর্মকর্তার বেতন প্রদান

www.nagorikpathagar.org

করবেন, জাগীর সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা করবেন, পবিত্র কাজে উৎসর্গীকৃত সম্পদের তত্ত্বাবধান করবেন, বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের জন্য অর্থবরাদ্দ করবেন এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের (যেমন আমীল) কাজকর্ম তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন, দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রদান করবেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবেন, টাকশালের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন যেন সুনির্দিষ্ট চাহিদাপত্র ছাড়া টাকশাল থেকে কোনো প্রকার অর্থ ছাড় করা না হয় এবং কৃষকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অবৈধ অর্থ সংগ্রহে বাধা দেবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাদেশিক দিউয়ানের দায়িত্বের পরিধি প্রদেশের রাজকীয় রাজস্বের পর্যায়ভুক্ত সবকিছু পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জনসাধারণের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো প্রাদেশিক দিউয়ান ও তাঁর দফতরের কর্মকর্তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। একই সাথে রাজকীয় রাজস্বের নিরাপত্তা, সরকারের আয়-ব্যয়, এক কথায় রাজকীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো দক্ষতার সাথে দিউয়ানি সংস্থাপনার কার্য সম্পাদনের উপর। মোগলদের অধীন বাংলার রাজকীয় রাজস্বকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভূমি রাজস্ব ও শুল্ক। সরকারি পরিভাষায় ভূমি রাজস্ব ও শুল্ক হিসেবে আদায়কৃত সকল রাজস্বকে 'মাল' বলা হতো; কিন্তু ভূমি রাজস্ব ও শুল্ককে পৃথক করে দেখানোর জন্য সকল শুল্ককে 'সাইর' বাচসায়ের বলা হতো। সুতরাং সাইর বলতে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব বুঝাতো, যেমন- আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, বাজারে বিক্রির জন্য আনীত দ্রব্যের উপর শুল্ক, বাজারে দোকানের উপর ধার্যকৃত কর, রাজকীয় টাকশালে মুদ্রা তৈরির জন্য মহাজনদের প্রদত্ত কর, হুন্ডির উপর বা বিলের মাধ্যমে টাকা বদলানোর জন্য ধার্যকৃত কর, জমিদার এবং বংশানুক্রমিক কর্মকর্তা, যেমন কানুনগোদের কাছ থেকে সংগৃহীত পেশকাশ বা সম্মানী এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তা কর্তৃক সম্রাটকে প্রদত্ত নযরানা বা উপহার প্রভৃতি।[১৪]

মোগল যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের সকল শুল্ক সংগ্রহকার্য বাংলার তিনটি বন্দর এবং বিহারের একটি বন্দরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। হুগলীর বখ্শ বন্দর আমদানি-রপ্তানি-শুল্ক সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, মুর্শিদাবাদের পাঁচোত্র বন্দর বাংলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শুল্ক সংগ্রহ করতো এবং ঢাকার শাহ বন্দর বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শুল্ক সংগ্রহ করতো। পাটনার বুদরেকা বন্দর (বুজুর্গ বন্দর)[১৫] অভ্যন্তরীণ এবং বাংলা ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের বাণিজ্য শুল্ক সংগ্রহ করতো।

এ-সকল বন্দর প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা মনে রেখে এ কথা বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঢাকা যখন রাজধানী- শহরে পরিণত হয়, তখনই সর্বপ্রথম মোগলরা ঢাকায় বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজদের বিতাড়নের পর ১৬৩২ সালে হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬](বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্ভবত শাহজাহান পর্তুগীজদের হুগলী থেকে বিতাড়িত করেন)। স্বরস্বতী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সাতগাঁও বন্দর বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার পরে হুগলীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। গঙ্গা নদীর গতিপরিবর্তনের ফলে রাজমহলের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং এই প্রাকৃতিক কারণেই হুগলী বন্দরের উত্থান হয়।[১৭] কিন্তু স্থলবন্দর হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

পাটনার উত্থানের কারণ স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও বলা যায় যে, হুগলীর মতো প্রাকৃতিক কারণে এর উত্থান হয়েছে। উইলিয়াম হেজেস-এর ডায়রী থেকে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ (তৎকালীন মকসুদাবাদ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং শুল্ক সংগ্রহকেন্দ্র ছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের দিউয়ানি স্থানান্তরের পূর্বে সেখানে পাঁচোত্রা বন্দর প্রতিষ্ঠার কোনো প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদে দিউয়ানি স্থানান্তর এবং পাঁচোত্রা বন্দর প্রতিষ্ঠার কারণে ঢাকার শাহ্ বন্দরের অধিক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[১৯]

যতদিন ঢাকা, বাংলার রাজধানী ছিল ততদিন সাইরসহ সকল রাজস্ব এই শহরে সংগৃহীত হতো এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীতে প্রেরণের পূর্বে সকল রাজস্ব এখানেই জমা হতো। এখানে বাংলার রাজস্বের ইতিহাস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যা দিউয়ানি সংস্থাপনা অথবা রাজস্ব প্রশাসনের সদর দফতর হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। ১৫৮২ সালে রাজা টোডর মলের রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলা থেকে ১০,৬৯৩,১৫২ টাকা রাজস্ব কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তা থেকে ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা রাজকীয় কর্মকর্তাদের জাগীর হিসেবে প্রদান করা হয়। জাগীরদারদের রাজস্ব সংগ্রহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ছিল। তাই দিউয়ানি ব্যবস্থাপনার খালিসা শরীফা বা রাজকীয় খাস জমির রাজস্ব বাবদ কেবল ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা সংগ্রহ করতে হতো।[২০] ১৬৫৮ সালে শাহ সুজা নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, যে বন্দোবস্তে বাংলার রাজস্ব টোডর মলের বন্দোবস্ত থেকে ১৫$\frac{১}{২}$ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেই বন্দোবস্ত মতে বাংলার সম্পূর্ণ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা, যার মধ্যে ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা ছিল জাগীরদারদের জন্য নির্ধারিত। দিউয়ানি সচিবালয় কর্তৃক সংগৃহীত খালিসা রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮৭,৬৭,০১৫ টাকা, যা টোডর মলের সময়কাল থেকে ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত দিউয়ানি কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। দিউয়ানি সংস্থাপনার গুরুত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যদি আমরা স্মরণ রাখি যে, জাগীর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ পূর্বের সমান থাকা সত্ত্বেও সময়ের ব্যবধানে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিজনিত কারণে আসল রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।[২১] উপরে রাজস্বের যে পরিমাণ দেখানো হলো তা হলো ভূমি রাজস্ব ও সাইর। কিন্তু পৃথকভাবে কোনো শাখার আয় কত তার অনুপাত এতে সুস্পষ্ট নয়। জাগীরের অংশ সংশ্লিষ্ট জাগীরদার কর্তৃক শাসিত হতো। কিন্তু সুবাদার, দিউয়ান এবং বখ্শিদের মতো বড় বড় মনসবদারেরা সদর দফতরে অর্থাৎ ঢাকায় বসবাস করতেন। তাই ঢাকা থেকেই তাঁরা তাদের জাগীরের রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। সুতরাং ১৭০২ সালে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক দিউয়ানি সচিবালয় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা থেকেই রাজস্ব প্রশাসন পরিচালিত হতো।

প্রশাসনিক সদর দফতর এবং রাজধানী হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব প্রমাণ করে এরূপ আর একটি তথ্য হচ্ছে শহরের মধ্যে একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা, যা রাজকীয় বিশেষাধিকারের স্বাক্ষর বহন করে। ঢাকায় টাকশাল প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে জাহাঙ্গীরনগর টাকশাল থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ১০২৬ হিজরি (১৬১৭ খ্রি:)।[২২] মোগল শাসনের শেষদিন পর্যন্ত এবং এমন কি কোম্পানির দিউয়ানি লাভের কয়েক বছর পর পর্যন্ত ঢাকায় টাকশাল চালু ছিল। প্রথমদিকে টাকশাল পরিচালনা ছিল রাজার বিশেষাধিকার। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল শাসনের শেষদিকে টাকশাল রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইউরোপীয় কোম্পানি, ব্যাংকার এবং বড় ব্যবসায়ীদের মোগল মুদ্রার মতোই ৩$\frac{১}{২}$ শতাংশ শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে মুদ্রা খচিত করার অনুমতি প্রদান করা হয়।[২৩]

ঢাকা নিয়াবতের অধিক্ষেত্র

সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, নায়েব-নাযিমদের আমলে রাজধানীর মর্যাদা হারানোর ফলে ঢাকার অবনতি সূচিত হয়। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভরকেন্দ্র ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। সুবাদারি, দিউয়ানি এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সংস্থাপনাও ঢাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু এযাবৎ কোনো পণ্ডিতই ঢাকা নিয়াবতের অধিক্ষেত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। সুতরাং নিয়াবত প্রতিষ্ঠার পরও ঢাকার গুরুত্ব অস্পষ্ট থেকে যায়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ গভীরভাবে পরীক্ষার পর প্রতীয়মান হয় যে, মর্যাদা হারানোর পরও ঢাকা পূর্ব বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকা (আজকের বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা) নিয়ন্ত্রণ করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত ঢাকা শহর তার পতন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের সূচনা এবং ঢাকায় নিয়াবত প্রতিষ্ঠা প্রায় সমসাময়িক ঘটনা।[২৫] এই নতুন পদ্ধতিতে *আইন-ই-আকবরীতে* বর্ণিত সরকারকে পুনর্বিন্যাস করে বাংলাকে তেরোটি অপেক্ষাকৃত বড় এককে বিভক্ত করা হয়, যাদের প্রত্যেকটিকে চাকলা বলা হতো।[২৬] ঢাকা নিয়াবতকে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), সিলেট ও ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) এ তিন চাকলার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। শেষোক্ত চাকলা দুটি পূর্বেকার সরকারের নামেই বহাল থাকে, কিন্তু চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের অধীন হয়ে গেল সরকার বাজুহা, সোনারগাঁও, বাকলা এবং সরকার ফতাহাবাদ ও মাহমুদাবাদের পূর্বাংশ।[২৭] অতএব ঢাকা নিয়াবতের সীমানা দাঁড়ালো উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে সাগর, পশ্চিমে সেলিমাবাদ পরগনা (আধুনিক বরিশাল জেলার পশ্চিম সীমানা) ও আতিয়া পরগনা (আধুনিক ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ) এবং পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম। আধুনিক ব্যবস্থা অনুসারে ঢাকা নিয়াবতের অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো আধুনিক ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ। মির্জা লুৎফুল্লাহ বা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের নিয়াবতকালে ১৭২৮ সালে মীর হাবিব ত্রিপুরা জয় করেন। ফলে নতুন বিজিত এলাকা চাকলা রৌশনাবাদ নামে ঢাকা নিয়াবতের অধিক্ষেত্রভুক্ত হয়।[২৮]

ঢাকা নিয়াবতের প্রশাসনযন্ত্র

ইংরেজদের দলিলপত্রের সাহায্যে নায়েব-নাযিমদের অধীনে ঢাকার প্রশাসনযন্ত্র সম্পর্কে সন্তোষজনক ধারণা লাভ করা যায়। ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে উপহার গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঢাকার প্রশাসন পরিচালিত হতো (ক) একজন নায়েব-নাযিম, (খ) একজন দিউয়ান, (গ) একজন কাজী, (ঘ) একজন মুফ্‌তি, (ঙ) একজন ওয়াকেয়ানবিশ, (চ) নওয়ারার একজন দারোগা, (ছ) তাঁতখানা ও মালবুস খাসের একজন দারোগা এবং (জ) একজন শহর-আমিন দ্বারা। এঁদের মধ্যে 'ছ' ও 'জ'

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যক কর্মকর্তা (যাঁদের সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে) ব্যতীত অন্য সকল কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড পর্যালোচনাকালে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকার প্রশাসনযন্ত্রের গঠন কাঠামো প্রাদেশিক প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামোর অনুরূপ ছিল। তবে তফাত ছিল এই যে শহরের মর্যাদা হ্রাস পাওয়ার ফলে কর্মকর্তাদের কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নিয়াবত-আমলে ঢাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করতো, কারণ ঢাকার কতিপয় কর্মকর্তা তাঁদের নিজদের নামে বড় বড় জাগীর ভোগ করতো।[২৯] এসকল কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল প্রদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদে কর্মরত তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নায়েব-নাযিমকে পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করতে এবং মগ দস্যুদের দমন করতে দেখা গেছে।[৩০] প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ঢাকা নিয়াবতের দিউয়ানি সংস্থাপনা সম্পর্কে আমরা একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারি।

জেমস্ গ্রান্টের[৩১] বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত এবং ১৭২৮ সালে সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের বন্দোবস্ত অনুসারে ঢাকা নিয়াবতের অধীনে চাকলা জাহাঙ্গীরনগর রাজস্ব প্রদান করতো ১৯,২৮,১৯৪ টাকা, সিলেট প্রদান করতো ৫,৩১,৪৫৫ টাকা এবং ইসলামাবাদ প্রদান করতো ১,৭৬,৭৯৫ টাকা।[৩২] ত্রিপুরা বিজয়ের পরে বিজিত এলাকা নিয়ে চাকলা রৌশনাবাদ গঠিত হয় এবং নতুন চাকলার প্রদত্ত রাজস্ব থেকে আয় হয় ৯২,৯৯৩ টাকা।[৩৩] ফলে ঢাকা নিয়াবতের মোট সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,২৯,৪৩৭ টাকা। সেই সময়ে ঢাকা থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থাপনা পরিচালনা করা হতো, যেগুলো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিকল্পিত হতো।[৩৪] তন্মধ্যে *আমলা-ই-নওয়ারা* নামে নৌবাহিনীর সংস্থাপনার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল ৭৬৮টি রণতরী এবং এর প্রধান দফতর ছিল ঢাকায়। কিন্তু এটি মূলত বাংলার পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলীয় জেলাসমূহকে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যু এবং আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বহাল রাখা হয়েছিল। ৯৩৩ জন ফিরিঙ্গি বা পর্তুগীজ নাবিকের বেতনসহ বিশাল নৌবহরের মাসিক খরচ ধরা হয়েছিল ২৯,২৮২ টাকা। রণতরী নির্মাণ ও মেরামত খরচসহ এই খরচ ধার্য করা হয়েছিল বার্ষিক ৮,৪৩,৪৫২ টাকা, যা চাকলা ইসলামাবাদ, সিলেট ও জাহাঙ্গীরনগরের সংগৃহীত রাজস্ব থেকে পরিশোধ করা হতো।[৩৫] *আমলা-ই-আসাম* নামে পরিচিত দ্বিতীয় সংস্থাপনা ছিল মূলত ৮,১১২ জন সৈন্যসহ এক বিশাল গোলন্দাজ সংস্থাপনা, যার সদর দফতর ছিল ঢাকায় এবং তা পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশসমূহ পাহারা দেওয়ার জন্য বহাল রাখা হয়েছিল। চাকলাসমূহের নিজস্ব দায় ছিল নিম্নরূপ[৩৬] :

সীরাব (সর-ই-আব)	মানুষ	পরগনা	মোট
ঢাকার নিম্নাঞ্চল এবং উপকূলীয় দুর্গসমূহ	২,৮২০	১৩ বড়	১,৩৫,০৬০ টাকা
ইসলামাবাদ	৩,৫৩২	১১৭ ছোট	১,৫০,২৫১ টাকা
রাঙ্গামাটি	১,৪৭৮	৪ বড়	৬৩,০৪৫ টাকা
সিলেট	২৮২	৪ বড়	১০,৮২৪ টাকা

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় সংস্থাপনা খেদা-আফইয়াল নামে পরিচিত। এর তত্ত্বাবধানে সিলেট ও ত্রিপুরায় সমপরিমাণ সংরক্ষিত জমি থেকে সমপরিমাণ হাতি ধরার খরচ বহন করা হতো।[৩৭] মোগল যুগে ঢাকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সম্রাট এবং নবাবের জন্য মসলিন বা সূক্ষ্মবস্ত্র সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে *দারোগা-ই-মালবুস খাস ওয়া তাঁতখানা* নামক একজন পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো।[৩৮] এই কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং সূক্ষ্মবস্ত্র সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

মুহাম্মদ রেজা খান কর্তৃক ঢাকার নায়েব-নাযিম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে দাখিলকৃত দলিলপত্রই হলো মোগলদের যুগের চাকলা জাহাঙ্গীর নগরের রাজস্ব সম্পর্কিত সর্বশেষ দলিলপত্র। এসকল দলিলপত্র সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোগল শাসনের ক্রান্তিকালে ঢাকার রাজস্ব সংগ্রহপদ্ধতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এতে দেখা যায় যে জাগীরজমি বহাল রাখা হয় এবং জাগীরদারদের নগদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। রাজস্ব সংগ্রহপদ্ধতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এতে দেখা যায় যে জাগীরজমি বহাল রাখা হয় এবং জাগীরদারদের নগদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। রাজস্ব প্রদানকারী একক পরগনা, তালুক এবং সাইরে দফাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়—*হুজুরী* এবং *নিয়ামত।* হুজুরী দফা ছিল ঐ জমি, যার রাজস্ব দিউয়ানি সংস্থাপনার মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট পরিশোধ করা হতো অথবা আগের দিনের খালিসা রাজস্ব ও মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট পরিশোধ করা হতো অথবা আগের দিনের খালিসা রাজস্ব ও নিয়ামত রাজস্ব ছিল ঐ রাজস্ব, যা নাযিম বা অন্যান্য জাগীরদারদের নিকট পরিশোধ করা হতো অথবা তা ছিল আগের দিনের জাগীর-রাজস্ব। প্রকৃতপক্ষে উভয় ধরনের রাজস্ব নায়েব-নাযিম ও দিউয়ান কর্তৃক আদায় করা হতো, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক হিসাব রাখা হতো। যাই হোক, নিযামত জমির মধ্যে দান হিসেবে প্রদত্ত জমি এবং *নওয়ারা, আমলা-ই-আসাম, খেদা-আফইয়াল* প্রভৃতি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত জমি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৩৯] কখন এ পরিবর্তন সাধিত হয় তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি তবে মুর্শিদকুলী খান এবং সুজাউদ্দিন খানের রাজস্ব সংস্কার এবং দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনা করলে ধারণা লাভ করা যায় যে, আলিবর্দী খানের সময়ে এ পরিবর্তন সূচিত হয়।[৪০] এই সময়ে নাদির শাহের আক্রমণের পরে মোগল কেন্দ্রীয় শক্তি কার্যত ভেঙে পড়ে। ফলে বাংলা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

উল্লিখিত পরিবর্তন ছাড়াও মোহাম্মদ রেজা খানের প্রদত্ত বিবরণ থেকে মোগল শাসনের শেষ পর্যায়ে ঢাকার সাইর সংগ্রহের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এটিই মোগল আমলে ঢাকার রাজস্বের একমাত্র বিস্তারিত বিবরণ, যা এখনও পাওয়া যায়। এই বিবরণে নিম্নোক্ত দফার সাইর-রাজস্বের উল্লেখ পাওয়া যায় :

হুজুরী মহাল[৪১]

১. শাহ বন্দর
২. ফন্দি কলনা (ফাঁড়ি কালনা)
৩. পরগনা ইব্রাহিমপুর
৪. পরগনা কুরিবারি

www.nagorikpathagar.org

৫. পরগনা তেরাবারীয়া
৬. সাইর যাত্রাপুর
৭. পরগনা সাহেবাবাদ বা ফিরিঙ্গিবাজার
৮. পেশকাশ বাজার
৯. গুজর মহাল
১০. দস্তক মহাল
১১. বাজার খিজিরপুর
১২. গোলাহ্ আমীরগঞ্জ

নিযামত মহাল
১. টোবাকো মহাল
২. পান মহাল
৩. মীরবাড়ির
৪. ধুপ মহাল
৫. গোলাহ্ আলমগঞ্জ
৬. চান্দিনা সাইর
৭. চক নিকাশ
৮. সোনারগাঁও–এর রতঞ্জয় ও অন্যান্য কানুনগোদের পরিশোধিত পেশকাশ এবং বাজিন্ত্রি ও গও–মহাল থেকে প্রাপ্ত করসমূহ।
৯. শহর–আমিন এবং কিফায়েত আখরাজাত কর্তৃক সংগৃহীত গৈরিয়াত বা অতিরিক্ত শুল্ক, জরিমানা ও কর অথবা নওয়ারা টোপখানা প্রভৃতির পরিশোধ্য রাজস্ব।
১০. ওয়াসিলাত–ই–হুন্ডিয়ান ইত্যাদি, সাইর সিককা বা অতিরিক্ত আবওয়াব অথবা বিবিধ নামের কর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক দলিলপত্রের সাহায্যে নিযামত মহাল ও হুজুরী মহালের অন্তর্ভুক্ত সাইরের দফাসমূহ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শাহ্ বন্দর বলতে অবশ্যই ঢাকার মিরপুরে প্রতিষ্ঠিত শাহ্ বন্দর বোঝায়। আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যসমূহের শুল্ক সংগ্রহের জন্য এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো এবং সরকার যথাযথ শুল্ক বা কর প্রদান সাপেক্ষে ব্যবসায়ীদের জন্য ‘রওয়ানাহ’ বা লাইসেন্স ইস্যু করতো। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুল্ক ও কর সংগ্রহ করার সুবিধার্থে বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বহু সংখ্যক ছোট ছোট পাহারা–চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৭৭৩ সালে শাহ্ বন্দরের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন চৌকির তালিকা পরিশিষ্ট–৪–এ প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু অধিকতর কৌশলগত পাহারা–চৌকি শাহ্ বন্দরের অধিক্ষেত্র থেকে পৃথক করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে স্বাধীনভাবে শুল্ক সংগ্রহের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। হুজুরী মহালের ২–৭ সংখ্যক চৌকি হলো স্বাধীন পাহারাচৌকি, যেগুলো শাহ্ বন্দরের সমপর্যায়ের ছিল এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর উপর শুল্ক সংগ্রহ করতো। খুব সম্ভব এগুলো সরকারি খাস জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩] সুতরাং এসকল স্থানে সংগৃহীত

www.nagorikpathagar.org

শুল্ক খাস জমির করের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। এসকল জায়গায় সাইর সংগ্রহের পৃথক চৌকি স্থাপনের পেছনে আরও একটি সম্ভাব্য যুক্তি হলো, এসকল চৌকি সাধারণ বাণিজ্যপথ থেকে এত বেশি দূরে ছিল যে, ঢাকার শাহ্ বন্দর দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। তাই পৃথক চৌকির প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এসকল চৌকিকে শাহ্ বন্দর থেকে পৃথক করার পেছনে একটি যুক্তি ছিল এই যে, এসব চৌকিকে পৃথক করে ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন করার ফলে ইজারাদারগণ দ্রুত কর আদায় করে থোক অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ইজারাদারগণ সাধারণত অধিকতর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতো। মোগল শাসনের শেষদিকে সরকারের পক্ষে এভাবে জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের প্রবণতাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের মন্তব্য করা সম্ভব নয়। হুজুরী মহালের ৮, ১১ ও ১২ সংখ্যক দফার করকে দোকানদারদের নিকট থেকে আদায়কৃত ভূমিকর বলে মনে হয়। ৯ নং দফার গুজর মহাল নামকরণ হয়েছে ঢাকা শহরের ধোপাদের নিকট থেকে কর সংগ্রহের কারণে।[৪৪] ১০ নং দফার দস্তক মহালকে ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। কারণ দস্তক শব্দটির অর্থ হলো পাস বা অনুমতিপত্র। সুতরাং শাব্দিক অর্থ থেকে একথা বলা যায় যে, দস্তক মহাল ব্যবসায়ীদের অনুমতিপত্র দিয়ে সংগৃহীত অর্থের সাথে সম্পৃক্ত। নিয়ামত মহাল হচ্ছে বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য বাবদ আদায়কৃত করের সমষ্টি। ১নং ও ২নং মহাল অর্থাৎ টোবাকো মহাল ও পান মহালের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কারণ এগুলোর নাম দেখেই বোঝা যায় যে, এগুলোর ক্ষেত্রে তামাক ও পান ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কর আদায় করা হতো। পরিশিষ্ট–৫ দেখলে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য পান্ত পর্যন্ত তামাক সরবরাহ এবং এ থেকে সংগৃহীত করের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নৌকা ও মাঝিমাল্লা থেকে আদায়কৃত করকে *মীরবারি* বলা হতো। পরিশিষ্ট–৬এ মীরবারি সংগ্রহের হার দেখা যেতে পারে। শহরে খড় বা ঘাসবিক্রেতার উপর ধার্যকৃত করকে ধুপ মহাল বলা হতো। পরিশিষ্ট–৬এ এই করের ব্যাখ্যা এবং তা সংগ্রহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গোলাহ আলমগঞ্জ হচ্ছে শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আলমগঞ্জ[৪৫] এলাকার দোকানদারদের কাছ থেকে জমির ভাড়া হিসেবে সংগৃহীত অর্থ। ঢাকার কালেক্টরের একটি পত্রে উল্লেখ আছে যে চাউলের উপর ধার্যকৃত কর সাইর নামে সংগৃহীত হয়েছে।[৪৬] ঢাকা শহরের দোকানের জমি এবং অন্যান্য দালানসমূহের উপর মাসিক ধার্যকৃত করকে সাধারণত চান্দিনা সাইর বলা হতো।[৪৭] দোকানের জমির ভাড়া ব্যতীত বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত দ্রব্যসমূহের উপর ধার্যকৃত করকে চক নিকাস বলা হতো।[৪৮] ৮নং দফায় তিন ধরনের অর্থ ধরা হয়েছে (১) সোনারগাঁও–এর কানুনাগো কর্তৃক পরিশোধিত সম্মানী, (২) বাজিন্ত্রি বা ঢাকা শহরের সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের উপর ধার্যকৃত কর এবং (৩) শহরে বিক্রয়ের জন্য আনীত গরুর উপর ধার্যকৃত কর। ৯ নং দফার কর নওয়ারা বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রাপ্ত জাগীর থেকে পরিশোধিত কর। এ থেকে ধারণা করা যায় যে,ইতোমধ্যে (১৭৬৫ সালে) নওয়ারা বিভাগ একটি অকার্যকর নৌসংস্থাপনায় পরিণত হয়েছে, যে কারণে এর কর্মকর্তাদের চাকুরির পরিবর্তে খাজনার বিনিময়ে জমি ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে। দশম দফার আদায়কৃত অর্থ হচ্ছে ব্যাংকার এবং বানিয়াদের কাছ থেকে সোনা–রুপার ব্যবসা এবং বিলের মাধ্যমে অর্থবিনিময় বাবদ আদায়কৃত কর।

www.nagorikpathagar.org

৬নং পরিশিষ্টে প্রদত্ত ঢাকা কালেক্টরের পত্র এবং জেমস্ টেলরের সাইর সংগ্রহের উপর প্রদত্ত বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, কর সংগ্রহের মাত্রা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কর সংগ্রহকারীগণ কৌশলে উদ্ভাবিত বহু পন্থায় সাইরের নামে জনসাধারণ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করতো। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার কালেক্টর এবং জেমস টেলর বলেছেন, 'কর নির্ধারণের হার এবং সংগ্রহের পদ্ধতি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কর সংগ্রহকারী এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হতো। এ সমস্ত কর সাধারণত ছিল অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলক ও নির্যাতনমূলক"।[৫০] মোগল যুগে কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহের পদ্ধতি যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল না বলে টেলরের অভিমতের সাথে আমরা একমত হতে পারি না। মোগলদের রাজস্বসংক্রান্ত বহু দলিলপত্র আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি কিছু দলিলপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছি (পরিশিষ্ট-৭ দ্র:), যাতে ঢাকাস্থ শাহ বন্দরের সংগৃহীত করের মানসম্মত হার বর্ণিত হয়েছে। সেখানে করের নির্ধারিত হারের এমন বিস্তারিত বিবরণ আছে যে, তা দেখে যে কেউই মোগল রাজস্ব বিভাগের যোগ্যতার প্রশংসা না করে পারবে না। সেখানে প্রতিটি ছোট, মাঝারি ও বড় নৌকা, প্রতিমণ জিনিস, প্রতিটি গরুর গাড়ি বা প্রতিজনের বোঝার উপর নির্ধারিত করের হার এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিস্তর জিনিসপত্রের উপর নির্ধারিত করের হার বর্ণিত আছে। শাহ বন্দরের দফতরে প্রাপ্ত কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা একটি দলিল প্রস্তুত করেছেন। দলিলটিতে প্রচুর অসামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতা রয়েছে। সম্ভবত দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে এরূপ হয়েছে। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এতে রক্ষিত বিপুল সংখ্যক আইটেমের করের তালিকা প্রমাণ করে যে, মোগল পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিক্রমধর্মী দক্ষতার স্বাক্ষর। দ্বিতীয়ত আজকের বিচারে মোগলদের সংগৃহীত সাইর-কর মোটেই উৎপীড়নমূলক ছিল না। সেই সাইরের অধিকাংশ মুহাম্মদ রেজা খানের বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা আজকের দিনের করসমূহের জন্য দায়ী এবং আমার বিশ্বাস, সেই করের হার কোনো অবস্থাতেই কম ছিল না। ঢাকার কালেক্টর এবং জেমস টেলর একথা বলে বাহবা নিয়েছেন যে কর্নওয়ালিসের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সাইর বিলোপ করেছে। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেননি যে, সাইর বিলোপ করা হলেও রায়তদের করের বোঝা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় নি, কারণ বিভিন্ন নামে ও প্রকারে করসংগ্রহ তখন অব্যাহত ছিল। কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের নিজ নিজ এলাকায় কর সংগ্রহের জন্য প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এ বক্তব্যের সমর্থনে আমরা সমসাময়িক লেখকদের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি, যাতে বলা হয়েছে যে, সাইরসমূহ বিলোপ করা হয়েছে। যে নীতির ভিত্তিতে এসব সাইর ধার্য করা হয়েছিল তা এখন পরীক্ষা করা বাহুল্যমাত্র। এতে কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারে বটে, কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। নীতিগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে নিশ্চিত ছিল না। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের অর্থ আদায়ের প্রবণতা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের ধুম লেগে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে অপব্যবহারের দিকটি

www.nagorikpathagar.org

সংশোধনের অবকাশ ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে ঐ অর্থ আদায়–ব্যবস্থা বিলোপকেই শ্রেয় জ্ঞান করা হয়েছিল। আইন–কানুনের অভাবে এবং সাইরের কর্মকর্তারা নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থ হওয়ার বাজারের পতন ঘনিয়ে এসেছিল এবং সাইর বিলোপের পর বাজারে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ একটি দুষ্টচক্র। এ বড়ো পীড়াদায়ক এবং মূল্যবান সময়ের অপচয়। এতে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য অথবা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বহুদূর ভ্রমণ করতে হতো। পণ্যের সহজ বিনিময়ের সুবিধার জন্য কৃষক ও ব্যবসায়ীদের একটি সুগম্য ও পরিচিত স্থানে মিলিত হওয়া একান্ত জরুরি। অসংখ্য বাজার লেনদেন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধন করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রেখেছিল। মাত্র চার বছর সময়ে বহু বাজার অচল হয়ে পড়ায় এবং বর্তমান বাজারসমূহের পতন ঘনিয়ে আসায় একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়েছিল। সাইর সংক্রান্ত আইন–কানুন প্রয়োগের মাধ্যমে যে বাণিজ্য সুবিধা পাওয়া যেতো, সাইর বিলোপ করে তা পাওয়া যায়নি। পরবির্তিত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে অন্য ক্ষেত্রে পুলিশ সংস্থাপনার তহবিলে প্রদান করা হয়েছে। আর যারা অর্থনীতিবিদদের অকার্যকর মতবাদ গ্রহণ করেননি, তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন কর সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে এবং ভূমিকর আনুপাতিকভাবে হ্রাস করে অভ্যন্তরীণ কর বৃদ্ধি করা অধিক যুক্তিযুক্ত কিনা।[৫১] তৃতীয়ত এ তথ্যটি আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, ঢাকার কালেক্টর অথবা জেমস টেলর আদৌ লক্ষ্য করেননি যে তাঁরা সাইরের যে বিভিন্ন অংক লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা ছিল মোগল শাসন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে উত্তরণের সুযোগে পরবর্তীকালে ইজারাদারদের উদ্ভাবন। ঢাকা কালেকক্টরের পত্রের সঙ্গে মুহাম্মদ রেজা খানের প্রদত্ত হিসাব তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে কালেক্টরের পত্রে এমন অনকে আইটেম ঢুকানো হয়েছে যেগুলো মুহাম্মদ রেজা খানের প্রদত্ত হিসাবে নেই। একথা বিশ্বাস করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ১৭৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ক্রান্তিকালে ইজারাদারগণ তাদের ইচ্ছামতো সাইরের আইটেম ও হার বৃদ্ধি করেছেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে ইংরেজ প্রশাসকগণ মোগল রাজত্ব প্রশাসন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করেছেন। বহু ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁরা মোগল প্রশাসন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।[৫২] উদাহরণস্বরূপ ঢাকার একজন কালেক্টর অভিযোগ করে বলেন, "উপরে প্রদত্ত হিসাব সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রদান করতে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন যে, এগুলোর উপর আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমিনদের মফঃস্বলে পাঠিয়ে মূল কাগজপত্র সংগ্রহ করার সময় হাতে ছিল না ; যারা তাদের প্রদত্ত বিবরণে সংগৃহীত অর্থের প্রকৃত বিবরণ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না, যারা তাদের প্রদত্ত বিবরণে সংগৃহীত অর্থের প্রকৃত পরিমাণ এবং কি পরিমাণ জমির জন্য তারা রাজস্ব প্রদান করেনি সেই তথ্য গোপন রেখেছে। এভাবে তথ্য গোপন করা তাদের স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, এই পর্যায়ের সকল হিসাবেই তারা ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছে।"

www.nagorikpathagar.org

টীকা

১. পি. সারণ, *Provincial Government of the Mughals,* পৃ. ১৭০।

২. এই অনুচ্ছেদের বেশির ভাগ তথ্য আবদুল করিম প্রণীত *Murshid Quli Khan and His Times* গ্রন্থের ৬১–৬২ পৃ. হতে নেয়া হয়েছে।

৩. *তুজুক–ই–জাহাঙ্গীরী,* রোজার্স এন্ড বেভারেজ, পৃ. ৭৮।

৪. এসকল যুদ্ধ এবং বিজয়ের কাহিনী এইচ. বি. ২ এবং এস. এন. ভট্টাচার্যের *Mughal North Eastern Frontier Policy* নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

৫. জে. এন. সরকার, *Bengal Nawabs,* পৃ. ৪–৯।

৬. এই অনুচ্ছেদের মর্মকথা প্রাগুক্ত *Murshid Quli Khan and His Times* গ্রন্থের ১৭–১৮ পৃষ্ঠার অনুরূপ।

৭. উদাহরণস্বরূপ *দিউয়ান–ই–ওজারত, দিউয়ান–ই–আরজ* ইত্যাদি।

৮. আই. এইচ. কোরেশী, *Administration of the Sultanate of Delhi,* পৃ. ১৮৯।

৯. ডবলিও. এইচ. মোরল্যান্ড, *Agrarian System of Moslem India,* পৃ. ১৫।

১০. *আকবরনামা,* ভল্যুম–৩, পৃ. ৬০৫, ৬০৭ ; মোরল্যান্ড, *Agrarian System of Moslem India,* পৃ. ১০৯।

১১. *তারীখ–এফ. ২৫ বি।*

১২. *মিরাত–ই–আহমদী,* অতিরিক্ত পাঠ, পৃ. ১৭২ ; এছাড়াও *History of Hindustan,* ভল্যুম–৩, পরিশিষ্ট–২।

১৩. পি. সারণ প্রণীত *Provincial Government of the Mughals* গ্রন্থে ১৯০–১৯১ পৃষ্ঠায় *মিরাত–ই–আহমদীর* উপর ভিত্তি করে প্রাদেশিক দিউয়ানের কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আরও দেখুন, *আওরঙ্গজেবের ফরমান,* জে. এন. সরকার অনূদিত, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ১৯০৬।

১৪. শোর ও গ্রান্টের প্রণীত *Fifth Report,* ভল্যুম–২–এর পরিশিষ্টে রাজস্ব সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ রেজা খানের ঢাকার রাজস্বের হিসাব ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ড, ভল্যুম–৪ এবং বৃটিশ রাজত্বের সূচনাপর্বের বেংগল রেভেনিও কনসালটেশানস–এ পাওয়া যায়।

১৫. বখ্শ, শাহ, বুজুর্গ ইত্যাদি ফার্সি শব্দ। বখ্শ অর্থ হলো বিভাগ এবং শাহ ও বুজুর্গ অর্থ হলো মহান বা বড়। পাচাত্র অর্থ হলো বর্ধিত শুল্ক। নামকরণের কারণে এসকল শব্দের প্রকৃতি ভিন্ন ছিল না। সম্ভবত এসকল শব্দ ব্যবহারিক পরিভাষা মাত্র।

১৬. *H.B.,* পৃ. ৩২৩।

১৭. টেভার্নিয়ার, *Travels in India,* ভল্যুম–১, পৃ. ১২৫।

১৮. *The Diary of William Hedges,* ভল্যুম–১, পৃ. ৫৮–৫৯, ৮৫–৮৭।

১৯. এই অনুচ্ছেদ এবং এর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ *Murshid Quli Khan and His Times* গ্রন্থের ২১২–১১৩ পৃ. হতে নেওয়া হয়েছে।

২০. *আইন,* ভল্যুম–২, পৃ. ১৪২, *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ১২০। এখানে সন্দেহের উদ্রেক হয় উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রকৃত সংগ্রহ কিনা অথবা মোরল্যান্ড *Agrarian System of Moslem India* গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় যে প্রশ্ন উথাপন করেছেন, তদনুযায়ী টোডরমলের

www.nagorikpathagar.org

বন্দোবস্ত প্রকৃত জমি জরিপের ফলাফল কিনা। কিন্তু উল্লিখিত সংখ্যাটিকে উপর্যুক্ত গবেষণার লক্ষ্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২১. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ১২০।

২২. এইচ এন. রাইট, *Catalogue of the Coin in the Indian Museum,* কলকাতা, ভল্যুম–৩, নং ৬৭৪, পৃ. ৭৮।

২৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His times,* পৃ. ৯৩–৯৭।

২৪. তুলনীয়, এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ৫০।

২৫. সম্ভবত ঢাকা নিয়াবত ১৭১৫–১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখুন, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম–৮, নং ১, পৃ. ৬৭–৭১ ; কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের সংস্কারের চূড়ান্ত বিকাশ হয় ১৭২২ সালে, যদিও তা শুরু হয়েছিল তাঁর শাসনের প্রথম দিকে।

২৬. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ১৮৯–১৯১ ; চাকলাসমূহের নাম হলো : (১) বন্দর বালেশ্বর, (২) হিজলী, (৩) মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল), (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) কুরিবারি, (১১) জাহাঙ্গীরনগর, (১২) সিলেট, (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

২৭. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ৯০।

২৮. জে. এন. সরকার, *Bengal Nawabs,* পৃ. ৯ : *রিয়াজ ; পৃ. ৩০১।*

২৯. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ২০২।

৩০. রিয়াজ, পৃ. ২৯৮–৩০১ ; *বি.পি.সি.* ২৮ শে নভেম্বর, ১৭২৬।

৩১. জেমস্ গ্রান্ট, *Analysis of the Finance of Bengal, Fifth Report,* ভল্যুম–২, পরিশিষ্ট–৪। আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে, গ্রান্টের প্রদত্ত রাজস্ব বিবরণ অযৌক্তিক নয়। দেখুন, আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His Times,* পৃ. ৮২।

৩২. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ. ১৯০।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, এখানে প্রদত্ত হিসাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করে। ইসলাম খানের আমলে ঢাকায় নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অটুট থাকে। সময়ের বিবর্তনের সাথে নৌবহরের সংখ্যা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের খরচেরও বিবর্তন হয়। বলা যেতে পারে, ইসলাম খান, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খানের আমলে এক্ষেত্রে অত্যধিক ব্যয় হতো, কারণ তারা অধিক বিজয় ও বিদ্রোহীদের দমনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। নৌবাহিনীর গুরুত্ব মুর্শিদকুলী খানের সময়কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং তার সময়কাল পর্যন্ত নৌবহরের রণতরীগুলো নিরীক্ষণ নিয়মিতভাবে করা হতো (রিয়াজ, পৃ. ২৮৩)। আলিবর্দী খানের সময়কালে নৌবহরের সংস্থাপনা অবহেলিত হয়। এর পেছনে প্রধান কারণ, জলদস্যুদের চেয়ে অনেক বেশি মারাঠা স্থলদস্যু দ্বারা তিনি সব সময় আক্রান্ত হতেন। তা ছাড়া নওয়ারা বিভাগের জাগীরদারি তাঁর সময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে পরিণত হয়।

৩৬. *Fifth Report,* ভল্যুম–২, পৃ.–২০৩।

www.nagorikpathagar.org

৩৭. *প্রাগুপ্ত।*

৩৮. তুলনীয় *B.P.C.* ১লা নভেম্বর, ১৭২৩, ৩রা আগস্ট, ১৭২৪।

৩৯. পরবর্তীকালে এসব সম্পদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনঃগ্রহণ করে। দেখুন, *পি.সি.সি.* পৃ. ৫৩–৮৮।

৪০. এস.এম. তাইফুর *(Glimpses of Old Dhaka)* বর্ণনা করেছেন যে, এ পরিবর্তন মুর্শিদকুলী খানের সময়কালে হয়েছিল। কিন্তু এ বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রকার প্রমাণ খুঁজে পাইনি, যদিও আমি মুর্শিদকুলী খান সম্পর্কে বহু দলিলপত্র (যেমন সলিমুল্লাহর *তারিখ-ই-বাঙ্গালা,* জেমস গ্রান্টের *Analysis of the Finance of Bengal* এবং *Public Consultations)* হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং সেখানে দেখা গেছে, তাঁর সময়কালে জাগীরদারেরা নিজেরাই তাঁদের প্রতিনিধির মাধ্যমে জাগীর প্রশাসন পরিচালনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মুর্শিদকুলী খান নিজেই শাহজাদা আজিম-উশ-শান এবং পরবর্তীকালে মীর জুমলা এবং খান-ই-দৌরান-এর পক্ষে তাঁদের জাগীর প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাঁদের জন্য পৃথকভাবে হুজুরীভূমি হতে অর্থ জমা রাখা হতো। তাঁর সময়কালে জাগীরের পুনর্দখল ছিল না এবং জাগীরদারকে কখনও নগদ অর্থ পরিশোধ করা হতো না।

৪১. সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ জনানার জন্য মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাব দেখুন, *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-৬, পরিশিষ্ট।

৪২. শাহ বন্দরের সংগৃহীত শুল্কের হার পরিশিষ্ট-৭এ দেখা যেতে পারে।

৪৩. *Topography,* পৃ. ২০৩–২০৫।

৪৪. *Bengal Board of Revenue (Miscellaneous) Proceedings* রেঞ্জ-৮৯, ভল্যুম-৩৬, *Consultations,* ১৩ই মে ১৯৭০, ঢাকা কালেক্টরের ৭ই মে, ১৭৯০ তারিখে লিখিত পত্রের ভিত্তিতে।

৪৫. দেখুন, রেনেলের মানচিত্র, সীট নং-১২।

৪৬. *Bengal Revenue Consultations,* রেঞ্জ-৮৯ ভল্যুম-১৩, *Consultations* ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৭৯১।

৪৭. বেংগল বোর্ড অব রেভেনিও (মিসেলিনিয়াস) প্রসিডিংস রেঞ্জ-৯৫, ভল্যুম-১৩, কনসালটেশনস্ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৭৯১।

৪৮. বেংগল বোর্ড অফ রেভেনিও (মিসেলিনিয়াস) প্রসিডিংস, রেঞ্জ-৯৫, ভল্যুম-১৫, পরিশিষ্ট।

৪৯. *Topography,* পৃ. ১৯৭–২০৩।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৫১. কোলব্রুক এন্ড ল্যাম্বার্ট, *Remarks on the present state of the Husbandry and commerce of Bengal,* পৃ. ৪৮–৪৯।

৫২. *Report on the Office of Kanungo,* জে. ভি. পিটারসন *Studies in the Land Revenue History of Bengal*-এ প্রকাশিত।

৫৩. *P.C.C.* ভল্যুম-৪, পৃ. ২০–২১।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা

নদীপথে চারিদিকের সকল অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত একটি কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার অবস্থান সমগ্র দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই শহরের প্রসার এবং এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শহরে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক এলাকা ও হাট-বাজারের উন্নয়ন অপরিহার্য করে তোলে। যেকোনো শহরের প্রসারের কারণে শহরে কারিগর, পণ্য প্রস্তুতকারক, শিল্পী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর বসতি স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে যাতে তারা এখানে অবস্থান করে কাঁচামাল ক্রয় এবং তৈরি মালামাল বিক্রয় করতে পারে। ঢাকা মোগল প্রদেশ বাংলার রাজধানী এবং সামরিক ও বেসামরিক সদর দফতরে পরিণত হয়। বণিক ও ব্যবসায়ীগণ সরকার থেকে পরোয়ানা ও লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য এবং কর সুবিধা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করার জন্য অথবা শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের শোষণ এবং অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য এখানে আগমন করতো। কিন্তু বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার বিকাশের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মোগল সরকার কর্তৃক ঢাকায় শাহ বন্দর প্রতিষ্ঠা। এই বন্দর থেকে এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য 'পরোয়ানা' (পাস বা পারমিট) ইস্যু করে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এই বন্দরের মাধ্যমে সকল ব্যবসায়ী বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

ঢাকায় বিদেশী বণিক

ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১০ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সময় থেকে ঢাকায় বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটে। তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ যেসব পরিব্রাজক বাংলায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে বতুতা, চীনা পরিব্রাজকগণ আদি পর্তুগীজ লেখক বারবোসা, ইতালীয় লেখক ভার্থেমা এবং ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশেষ পরিব্রাজক রলফ্ ফিচ (ইংরেজ পরিব্রাজক)। তাঁরা সকলেই সোনারগাঁওয়ের বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতির প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের কেউই ঢাকার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাথে ঢাকা ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। এ কেবল অনুমান নয়, মির্জা নাথনের বক্তব্য থেকেও তা প্রমাণিত হয়। ইসলাম খানের ঢাকায় আগমনের কয়েক বছর পরে মির্জা নাথন ঢাকায় এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১] সেই সময় থেকে ঢাকার অগ্রগতি এবং বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে, শুধুমাত্র ব্যক্তি-ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারগণ ঢাকায়

www.nagorikpathagar.org

আসেননি, বরং সংগঠিত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহও ঢাকায় কারখানা স্থাপন করেছিল এবং মোগলদের এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানীর সাথে খুবই জমজমাট এবং লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল।

শহরের আদি পর্বে এখানে আগত বিদেশী ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় সেবাস্তিয়ান ম্যানরিকের বর্ণনায়, যিনি নিজে একজন পর্তুগীজ ধর্মযাজক ছিলেন এবং ১৬৪০ সালে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এই শহরে বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবিধা থাকার কারণে বহু বিচিত্র জাতির ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ভিড় জমাতো।[২] এই সকল লোকের মধ্যে খত্রী এবং দিনমজুরের কথা তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এসব দিনমজুর বেশি বেতনের জন্য ঢাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ম্যানরিক বহু বিচিত্র জাতির সংজ্ঞা প্রদান করেননি, কিন্তু খত্রীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, তাদের গৃহ টাকায় ভর্তি থাকতো এবং তারা টাকা গণনার পরিবর্তে ওজন করতো। নিঃসন্দেহে এই বর্ণনা ব্যাংকারদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য, যারা খত্রী রাজপুত গোত্রের বংশধর ছিল। আজকের দিনে সাধারণভাবে তাদেরকে মাড়ওয়ারী বলা হয়। কারণ তারা রাজপুতনার মাড়ওয়ার হতে এসেছিল। ম্যানরিকের নিকট টাকা ওজন করার ব্যাপারটি অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এটা ছিল সাধারণ রীতি। সম্ভবত মুদ্রার ওজনের যে ভিন্নতা মোগল যুগের শেষদিকে ব্যাংকার এবং ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছিল তখনও তা শুরু হয়নি।[৩] মুদ্রা ওজন করার পদ্ধতি এখনও ইংল্যান্ডে প্রচলিত আছে। ম্যানরিক আরো বলেন যে, ঢাকাই মসলিন খোরাসানের মতো দূরবর্তী স্থানেও রপ্তানি হতো এবং এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দূরবর্তী দেশের বণিকগণ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বণিকগণ ১৬৪০ সালের মধ্যে ঢাকায় এসেছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্রে মূর, মোগল, পাঠান, তুরানী প্রভৃতি বহু বণিকগোষ্ঠীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব নাম আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে আগত বণিকগোষ্ঠীর গোত্রীয় পরিচয় বহন করে। এরা ব্যতীত আর্মেনিয়ার বণিকগণও ঢাকায় এসেছিল এবং তারা ঢাকার রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। এসব বণিক সংগঠিত ছিল না, তাঁরা পৃথক পৃথক ব্যক্তি–ব্যবসায়ী হিসেবে এসেছিল। সুতরাং তারা ছিল সংগঠিত ইউরোপীয় কোম্পানি থেকে ভিন্ন। ঢাকায় তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ১৮০০ সালে টেলর প্রদত্ত 'ঢাকার বিবরণে' জানা যায়।[৪] তাঁর বিবরণে দেখা যায় যে, এসব বণিক দেশীয় বাণিজ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তারা যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করতো তা সংগঠিত কোম্পানিগুলোর রপ্তানির চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। খুব সম্ভবত এসব বণিক ম্যানরিকের বর্ণিত বিচিত্র জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ম্যানরিক ঢাকায় অবস্থানকালে ঢাকায় বাণিজ্যরত কোনো কোম্পানির নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেই সময় ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকরা তিনটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এও সম্ভব যে, একই সময়ে পর্তুগীজ বণিকরাও ঢাকায় আগমন করেছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকগণ ম্যানরিকের ঢাকায় আগমনের অনেক পরে ঢাকায় আগমন করেছিল। পরবর্তী পরিব্রাজক মানুচি ১৬৬৩ সালে এবং টেভার্নিয়ায় ১৬৬৬ সালে ঢাকায় এসেছিলেন। উভয়েই ঢাকায় ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যের

www.nagorikpathagar.org

কথা উল্লেখ করেছেন। এখন ঢাকায় ইউরোপীয় সংগঠিত কোম্পানিসমূহের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিবৃত করবো।

পর্তুগীজ বণিকগণ

পর্তুগীজগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ষোড়শ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সর্বপ্রথম বাংলায় এসেছিল। ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হওয়ার আগেই পর্তুগীজগণ হুগলীতে বসতি স্থাপন করে এবং বাংলার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই তাদের লুণ্ঠনবৃত্তি ও অত্যাচারী স্বভাবের জন্য স্থানীয় জনগণ ও মোগল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। যখন শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর নির্দেশক্রমে বাংলার মোগল সুবাদার ১৬৩২ সালে পর্তুগীজদের হুগলী থেকে বিতাড়িত করেন।[৫] এর পরে তারা উপকূলে আশ্রয় নেয় এবং সন্দ্বীপ, দেয়াং ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তাদের লুণ্ঠনবৃত্তি অব্যাহত রাখে। আরাকানী মগদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় পর্তুগীজেরা যে সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল তার বিনিময়ে নবাব শায়েস্তা খান কিছু সংখ্যক পর্তুগীজকে শহরের ১২ মাইল দক্ষিণে ইছামতি নদীর তীরে জমি প্রদান করেছিলেন।[৬] সেই জায়গা পরবর্তীকালে সাহেবাবাদ বা ফিরিঙ্গিবাজার নামে পরিচিতি লাভ করে এবং মোগল শাসনের শেষদিকে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত হয়।[৭] সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে পর্তুগীজরা ঢাকায় একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে তাদের কুঠির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।[৮] ম্যানরিক, মানুচি ও অন্যান্য লেখকগণ ঢাকায় যে পর্তুগীজ গির্জার বিবরণ দেন তা আজও বিদ্যমান। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঢাকায় পর্তুগীজ বসতি ছিল।[৯] সম্ভবত পর্তুগীজদের নিপীড়নমূলক স্বভাবের কারণে এবং প্রধানত ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে না পারায় ঢাকায় পর্তুগীজদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করেনি।

ওলন্দাজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীগণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা শুরু করে এবং তাদের ব্যবসা এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, ব্যবসাক্ষেত্রে তারা পর্তুগীজ ও ইংরেজদের ছাড়িয়ে যায়। পরে পর্তুগীজদের সাথে কঠোর প্রতিযোগিতায় ইংরেজরা প্রাধান্য বিস্তার করে। বাংলায় ওলন্দাজরা প্রথম কুঠি স্থাপন করে পিপলি বন্দরে। কিন্তু পরে তা বালেশ্বরে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপনের পর বাংলায় তাদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং এই স্থানটি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় তাদের প্রধান বসতিতে পরিণত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওলন্দাজরা ১৬৬৩ সালে ঢাকায় কুঠি স্থাপন করেছিল। তাদের মূল কুঠি ছিল তেজগাঁওতে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা বুড়িগঙ্গার তীরে আজকের সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায় আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। ঢাকায় ওলন্দাজদের ব্যবসা খুব ব্যাপক ছিল না। থমাস বৌরীর মতে, ঢাকায় ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ছিল খুবই সামান্য।[১০] ঢাকায় ওলন্দাজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমাদের জানাও নেই। এর কারণ, খুব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর

www.nagorikpathagar.org

শেষার্ধে ভারতে ওলন্দাজের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে, যার ফলে ঢাকায় তাদের কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়ে। জন টেলরের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা দেশী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ঢাকায় পণ্য সংগ্রহ করতো।[১১] ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত সুতাজাত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে দেখা যায় যে, ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানির তুলনায় ওলন্দাজদের রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। ১৭৮১ সালে ঢাকাস্থ ওলন্দাজ সম্পত্তি ইংরেজদের কাছে সমর্পিত হয় এবং ১৮৩৪ সালে তা ইংরেজদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।[১২]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফরাসীরা ঢাকায় আগমন করে। ১৬৮২ সালে তাদের নৌকাসমূহ সর্বপ্রথম ঢাকায় পৌঁছে এবং ১৬৯০ সালে এম. গ্রেগোরী ফরাসী বাণিজ্যকুঠির প্রধান ছিলেন। ফরাসীরা তেজগাঁও এবং বুড়িগঙ্গার তীরে কুঠি স্থাপন করে, যেখানে আজকে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। ১৭৩০ সালের পূর্বে বাংলায় ফরাসীদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করেনি। অতঃপর ফরাসী কোম্পানির পরিচালক হিসেবে ডুপ্লের আগমনের সাথে সাথে তাদের বাণিজ্যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয় এবং তারা শুধু লাভজনক বাণিজ্যই করেনি, বরং ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করতেও সক্ষম হয়। এই অধ্যায়ের শেষদিকে আমরা দেখতে পাব যে ১৭৪৭ সালে ফরাসী কোম্পানি ও ফরাসি সাধারণ ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে তিন লাখ টাকার বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করেছিল। এই কোম্পানি ঢাকা শহরের পূর্বসীমানায় ফরাশগঞ্জে (যার মূল নাম ফ্রেন্সগঞ্জ) বহু সম্পদও অর্জন করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পরে ঢাকায় ফরাসী বাণিজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে এবং ১৭৭৪ সালে ফরাসী কুঠি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১৩]

ইংরেজ বাণিজ্য

হুগলীস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে 'ঢাকার ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে'— এ মর্মে অনুকূল রিপোর্ট পাওয়ার পর ইংরেজ কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ১৬৬৮ সালে বাংলায় তাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশ প্রদান করে তারা যেন দুই বা তিন জন উপযুক্ত লোককে ঢাকায় পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে ঢাকায় উৎপাদিত কাপড় ইত্যাদির নমুনা তাঁদের নিকট সরবরাহ করে।[১৪] এই নির্দেশের ভিত্তিতে ১৬৬৯ সালে ইংরেজরা ঢাকায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এবং জন মার্চ ও জন স্মীথকে ঢাকার বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়।[১৫]

কুঠি স্থাপনের আগে দুইজন ইংরেজ ঢাকায় এসেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথম ব্যক্তির নাম জেমস্ হার্ট, যিনি ইংরেজদের কুঠি প্রতিষ্ঠার বহু আগেই ঢাকায় ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তেজগাঁওতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাঁর ব্যবসা খুব বেশি লাভজনক না হওয়ার কারণে তিনি তাঁর জমি ও সম্পদ ইংরেজ কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করেন। ঢাকায় কুঠি স্থাপনকালে কোম্পানি সম্ভবত অতি সহজ শর্তে হার্টের জমি ক্রয় করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।[১৬] ঢাকায় আগত দ্বিতীয় ইংরেজ হলেন টমাস্ প্রাট। তাঁর সাথে মানুচির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি মীর জুমলার অধীনে চাকুরি করতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় কুঠি স্থাপনের পূর্বে তাঁকে ঢাকার পণ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিল।[১৭]

www.nagorikpathagar.org

১৬৬৯ সালে ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয় এবং তা ১৬৯০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। একজন চিফ বা প্রধানের নেতৃত্বে এক অথবা দুইজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিষদ তাদের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ঢাকায় বসবাস করতো। চিফ ও প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম জে.টি. রেনকিন কর্তৃক প্রকাশিত ঢাকা ডায়রীতে পাওয়া যায়।[১৮] ১৬৯০ সালে যখন বাংলায় ইংরেজগণ জব চার্নকের নেতৃত্বের মোগল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনই ঢাকা কুঠি বন্ধ হয়ে যায়।[১৯] ১৭২৩ সালে মুর্শিদকুলী খানের আমলে সেই কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২০] তখন থেকে ইংরেজ কুঠি ঢাকার সঙ্গে বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। ইংরেজরা এই প্রদেশের প্রভুতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত এই বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।[২১]

ব্যক্তি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্মেনিয়া, আরব, পারস্য ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ব্যবসায়ীদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সাধারণত 'মূর' বলা হতো, তবে কোনো কোনো সময় তাদের গোত্রীয় পরিচয়ে তুরানি, পাঠান ও মোগল বলা হতো। কিন্তু ঢাকায় বিকাশমান ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থানীয় জনসাধারণ কিরূপ অংশগ্রহণ করেছিল তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশের বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এমন কিছু লোকের নাম পাওয়া যায়, যদিও তাদের জন্মস্থান নির্ণয় করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এসব ব্যবসায়ীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) ব্যাংকার বা ব্যাংকিং ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং (২) কোম্পানির পক্ষে ব্যবসারত ব্যবসায়ী শ্রেণী, যারা বিভিন্নভাবে কোম্পানির সেবা করতো, বিশেষত কোম্পানির জন্য দ্রব্য সংগ্রহ করতো এবং এজন্য তাদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হতো। এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় ইংরেজ কোম্পানির ঢাকার ফেক্টরি-রেকর্ডে এবং এগুলো সবই অষ্টাদশ শতাব্দীরই তথ্য। এই সময়ে নিম্নোক্ত ব্যাংকার ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ঢাকায় ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল[২২]:

১. শেঠ মাহতাব রায়
২. শেঠ স্বরূপচাঁদ
৩. শিব রায় নয়ন চাঁদ
৪. জগৎ শেঠের গোমস্তা
৫. ধনরাম
৬. খোশাল চাঁদ মতি চাঁদ
৭. আলমচাঁদ নিমচাঁদ
৮. অনুপচাঁদ কিষেণ চাঁদ বা কৃষ্ণ চন্দ্র
৯. বিঙ্কর দাস
১০. মতিরাম সেন
১১. শান্তি রাম
১২. বলরাম রায়
১৩. হরি কিষেণ বা হরিকৃষ্ণ
১৪. আনন্দ রাম

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত নাম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মনে হয় রাজপুতানা বা বাংলার বাইরে থেকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এসেছিল।

কলিকাতায় ইংরেজদের পুঁজি বিনিয়োগ নীতি সম্পর্কে কতিপয় পণ্ডিত আলোচনা করেছেন।[২৩] সাধারণত রীতি ছিল দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়োগ করা। এসব ব্যবসায়ীকে তাদের সংগৃহীত দ্রব্যের ৭৫% পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হতো। দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে কোম্পানির কাছে সরবরাহ করার পর অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হতো। অগ্রিম প্রদানকে 'দাদনি' বলা হতো এবং অগ্রিম গ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা দাদনি ব্যবসায়ী বলে পরিচিত হতো। ঢাকাতেও সেই একই রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগত পরিবর্তনের ফলে 'দাদনি' শব্দটির পরিবর্তে 'পত্তন' শব্দ ব্যবহৃত হতো। বিদেশে জাহাজ পাঠাবার মৌসুমের শুরুতে ঢাকা কাউন্সিল কলিকাতা থেকে সেই মৌসুমেই ঢাকা থেকে সংগ্রহযোগ্য দ্রব্যের একটি তালিকা লাভ করতো ; তদনুসারে তারা টাকা অগ্রিম দিত এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতো।

১৬৭৬ সালে ঢাকা থেকে কিভাবে দ্রব্য সংগ্রহ করা হতো নিম্নের বিবরণে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় :

"I. The most proper season for giving out monies [money] for cossaes *[Khassas]* muHmulls *[malmals],* & ca. made in and about Dacca, is the month of January.

"2. Dellols [dalals] or brokers, accustomed with, and appointed by the government to the business of cloth, take four months' time for its delivery ; and, within six months of thereabouts, do usually bring in the same brown [i.e. unbleeched] as it comes form the weavers.

"3. The said brokers having took money, deliver it to the picars *[paikars,];* who carry it from town to town and, deliver it to the wavers: so that, the only security of the picars *[paikars]* are the weavers: of the brokers are the picars ; and of the Honourable Company's money, the brokers.

"4. Brown musters pieces are customarily bought, and their prices agreed on before money delivered: though divers Arabians and Moguls, who trade in Dacca cloth, carrying away yearly very considerable quantities of the same overland, some so far as the great Turk's dominions, agree, at first ; on no certain price : but receive their goods at the time limited; the dellols *[dalals]* or merchants of the town, then valuing them according to the market price.

"5. When the Honourable Company's cloth is brought in, the brokers overlook, sort and prize it : from which they have afore received of the picars, by deduction, two rupees on each hundred rupees; at which time, the chief, & ca take good care to interpose with their judgements ; demanding

www.nagorikpathagar.org

abatements and always receiving the same, (though not according to equal proportion), for want of breadths and lengths and goodness; but cloth much worse than muster is returned back provided the brokers are not thought doubtful.

"6. What money is agreed to be paid upon abatements, the delols [*dalals]* usually make good in specie ; unless cloth according to muster be procurable.

"7. If at any time it happens, that the delols seem to be partial in overrating the goods: a merchant of the city is by joint consent, chosen, and desired to determine therein and cloth so accordingly."[28]

১৭৩৭ সাল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ পর্যন্ত ঢাকা কাউন্সিলের সকল পত্তনি ব্যবসায়ীদের নাম মাঝে মাঝে বাদ গেলেও ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ডে মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়। এসকল ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হতো এবং তারাই মোগল শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্তন হতো। উদাহরণস্বরূপ ১৭৩৬ সালে নিম্নোক্ত ব্যবসায়ীগণ পণ্যসামগ্রীর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল : ২৫

নাম	চুক্তিভুক্ত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম হিসেবে গৃহীত টাকার পরিমাণ
১। রামনারায়ণ দালাল	টাকা ২১,০০৭-৪-০	টাকা ১৮,৯০৬-৮-০
২। নেটু দালাল	টাকা ৮,৭২৫-০-০	টাকা ৭,৮২৭-৮-০
৩। সোনামনি দালাল	টাকা ৮,০১০-৪-০	টাকা ৭,১৮৬-১২-০
৪। মুক্তাগোলাব পাকার	টাকা ১৩,২৫৭-৪-০	টাকা ১১,৮৮১-৮-০
৫। হাফিজুল্লাহ পাইকার	টাকা ১,৯১৫-০-০	টাকা ১,৭৩৮-৮-০
৬। বিষ্ণুদাস পাইকার	টাকা ১,৩২৮-০-০	টাকা ১,২০২-১২-০
৭। জয়কৃষ্ণ পাইকার	টাকা ১০,০৫৭-৪-০	টাকা ৯,০২৬-৮-০
৮। চনুল নান্দেজাম	টাকা ১,৩১১-০-০	টাকা ১.১৮৫-৯-০

উল্লিখিত নামসমূহ মোগল যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত বার বার দেখা যায়, তবে মাঝে মাঝে অন্য দুই একজনের নামও যুক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু রামনারায়ণ, নেটু, সোনামনি, হাফিজুল্লাহ, বিষ্ণুদাস, জয়কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা সকলে বাঙালি হলেও নিঃসন্দেহে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দেশের বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানি অথবা বহিরাগত মুসলমান অথবা আর্মেনীয় ব্যবসায়ীদের চাইতে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য।

www.nagorikpathagar.org

বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার স্থান

দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢাকা দ্বৈত ভূমিকা পালন করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ছিল (ক) পণ্য উৎপাদনকেন্দ্র ও বিপণনকেন্দ্র হিসেবে বিকাশমান একটি শহর এবং (খ) দেশী ও বিদেশী দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিস্থল হিসেবে গড়ে ওঠা একটি বন্দর। ঢাকা বন্দর দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য ও ঢাকায় উৎপাদিত পণ্য গ্রহণ করে বহির্বিশ্বে এবং মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানির জন্য উপকূলীয় বন্দর বা অভ্যন্তরীণ বন্দরে প্রেরণ করতো। একইভাবে ঢাকা বন্দর বিদেশ থেকে ঢাকায় আমদানিকৃত পণ্য গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করতো।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থানসমূহের নাম থেকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন এলাকার পরিচয় স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁতিবাজার ও জুগিনগর ছিল তাঁতিদের, কামারনগর ও বানিয়াননগর ছিল স্বর্ণকার, রৌপ্যকারও কামারদের, পাটুয়াটুলী ছিল চিত্রশিল্পীদের, সূত্রাপুর ছিল ছুতার মিস্ত্রিদের, কামারটুলী ছিল কামারদের এবং শাঁখারিবাজার ছিল শাঁখারিদের (শঙ্খের কাজ) এলাকা। এসকল এলাকার শিল্পীকুশলী ও পেশাজীবী শ্রেণীর লোকদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, তারা শহরে দলবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের তৈরি সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির জন্য সংগ্রহ করা হতো এবং স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য শহরের বাজারে সরবরাহ করা হতো। অধিক সংখ্যক বাজার ও গঞ্জের নাম হতে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো স্থানীয়ভাবে তৈরি সামগ্রী এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার অবস্থান বুঝতে হলে বিষয়টি বৃহত্তর পরিসরে পর্যালোচনা করতে হবে অর্থাৎ ঢাকা শহরে বাজারজাত দ্রব্য এবং ঢাকার শাহ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্য সম্পর্কে ধারণালাভ করতে হবে। ঢাকা শহর এবং শাহ বন্দরে আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য পরিশিষ্টসমূহে দ্রব্যের তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। এই তালিকা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের প্রাথমিক যুগের দলিলপত্রের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-৮এ ১৭৬৮ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ঢাকার বাজারে আনীত দ্রব্যের তালিকা এবং ১৭৭৩ সালে ঢাকা থেকে কলিকাতায় প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট-৯এ ঢাকা জেলার হাট-বাজার ও গঞ্জ থেকে আদায়কৃত করের গড় হিসাব দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট-১০এ কলিকাতা এবং দূরবর্তী এলাকায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে ঢাকা এবং নিকটবর্তী বন্দরসমূহে আনীত দ্রব্যসামগ্রীর দৈনিক হিসাব দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট-১১এ ঢাকা থেকে দূরবর্তী এলাকার (দ্রব্য প্রেরণের অনুমতিপত্র) হিসাব দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১০ মূলত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সংগৃহীত দৈনিক করের হিসাব। কিন্তু এতে উৎপাদনস্থল থেকে অভ্যন্তরীণ বন্দরসমূহে, বিশেষত ঢাকায় দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে দূরবর্তী স্থানসমূহে রপ্তানি করতো। এসব তালিকায় আলোচ্য সময়ের অতি অল্পকাল পরের তথ্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঢাকার বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃতির এবং এগুলো স্থানান্তরের বাণিজ্যপথের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি, যদিও রাজনৈতিক বিপ্লব, প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং ইংরেজ কোম্পানি, কোম্পানির

www.nagorikpathagar.org

কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্বাধীন ইংরেজ বণিকের প্রভাবের কারণে বাণিজ্যের আয়তন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। পরিশিষ্টগুলোতে প্রদত্ত তালিকাসমূহ স্বব্যাখ্যাত। কিন্তু উপস্থিত রেফারেন্সের প্রয়োজনে আমরা নিম্নের দ্রব্যতালিকা তৈরি করতে পারি, যাতে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের (আমদানি ও রপ্তানি) পণ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্যগুলো হচ্ছে-সুতিবস্ত্র, চাটি (এক ধরনের গৃহনির্মিত প্রদীপ), চটের থলে, কালোজিরার দানা, তৈল, হাতির দাঁত, সুপারি, পান, তামাক, মাদুর, সুতা, তুলা, চাউল, খেসারী, মুগ, মশুর, কলাই, বুট, মটর, সরিষা, বীজ, পিয়াজ, চিনি, গুড়, ঘি, লবণ, আদা, মরিচ, চিড়া, নারিকেল, মাছ, কাঠ, নৌকা, কাঠের আসবাবপত্র, কালি, কাগজ, মাটির পাত্র, সোনা-রুপা, লোহা ও তামার তৈরি জিনিসপত্র, মধু, পাথর, বাঁশ, ঝুড়ি, আফিম, শাকসবজি, নলখাগড়া ও ফল।

পণ্যসামগ্রীর তালিকা পরীক্ষা করে এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— (১) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য, (২) দেশে উৎপাদিত পণ্য এবং (৩) দেশের নদী, বন ও কৃষিজমি থেকে উৎপাদিত পণ্য। বিদেশী কোম্পানিসমূহের আমদানিকৃত দ্রব্য প্রধানত লোহা, তামা, পিতল, টিন ইত্যাদি ধাতব পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলো আমদানির পরিমাণ ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের চাইতে এতই কম ছিল যে, বিদেশী কোম্পানিসমূহ সব সময় আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য রুপার পাত আমদানি করতো।[২৬] উৎপাদিত দ্রব্যের একটি অংশ শহরের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হতো, যেমন তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার ইত্যাদি স্থানের নাম দেখে আমরা ধারণা করতে পারি। কিন্তু অধিকাংশ উৎপাদিত দ্রব্য, বিশেষত সুতিবস্ত্র ঢাকার চারপাশের স্থান থেকে এবং তাঁতের কেন্দ্র থেকে আসতো। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন ছিল। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ দ্রব্য ঢাকার আশেপাশের জেলাসমূহ থেকে আসতো, যদিও খুব সামান্য অংশ, বিশেষত তরিতরকারি ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে উৎপন্ন হতো। রেনেলের মানচিত্রে নির্দেশিত বাগানসমূহ, যেমন ইংরেজ বাগান, ওলন্দাজ বাগান ইত্যাদি নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের বাগানের মতো প্রমোদ-উদ্যান ছিল না, বরং সেগুলো ছিল ফল এবং শাকসবজির বাগান। রেনেলের মানচিত্রে দক্ষিণে কাওরান বাজার বা কাওরান নদীর নিকটবর্তী আম্বর সেতু থেকে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় প্রচুর গাছপালার এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট-১০ এসব পণ্যের উৎপাদনস্থলসমূহ এবং ঢাকার বাজারে এসব পণ্য আনয়নের পথসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এই পরিশিষ্টটি একাদশ পরিশিষ্টের সাথে একত্রে দেখলে প্রাথমিক উৎপাদনক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী স্থানে এবং উপকূলীয় বন্দরে পণ্য প্রেরণের পথ শনাক্ত করা যায়, যেপথে এসব পণ্য পুনরায় বাংলার সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে অথবা বিদেশে প্রেরণ করা হতো। পণ্য সরবরাহকারী প্রধান জেলসমূহের নামও জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ সিলেট থেকে চুনা, পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার মাধ্যমে আফিম, থাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলা থেকে কার্পাস, রংপুর থেকে তামাক, ফরিদপুর, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ ও যশোহর জেলা থেকে গুড় আসতো। প্রায় সকল জেলা কম-বেশি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করতো, কিন্তু উল্লিখিত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করতো, যা ঢাকা শহরের মাধ্যমে রপ্তানি হতো। চাউল

www.nagorikpathagar.org

ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের মৌসুমে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে সরবরাহ করা হতো, কিন্তু বাকেরগঞ্জ জেলা ছিল বৃহৎ সরবরাহকারী জেলা। কাঠ ও তক্তা চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ, সিলেট ও খুব সম্ভবত ময়মনসিংহ থেকে আসতো।

ঢাকা থেকে পরিচালিত বাণিজ্যের পরিমাণ

মোগল যুগে ঢাকার বাণিজ্যের পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাবই একমাত্র নির্দেশক, যেখানে ১৭৬২–৬৩ (বা ১১৬৯) সালে হুজুরী এবং নিযামত মহাল উভয় বাবদ সংগৃহীত সাইর করের পরিমাণ ছিল টাকা ৩,৩৪,৮৩৭–২–১৮–২।[২৭] প্রচলিত হারে কাস্টম ট্যাক্স $২\frac{১}{২}$% ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, ঢাকার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল টাকা ১,৩৩,৯৩,৫০০[২৮]। কিন্তু এ ধরনের হিসাব বিভ্রান্তিকর। সপ্তম পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুসারে শাহ বন্দর কর্তৃক সংগৃহীত করের পরিমাণ $২\frac{১}{২}$%–এর পরিবর্তে নৌকার আকৃতি ও বোঝার ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হতো। দ্বিতীয়ত, পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে[২৯] যে সাইর কেবলমাত্র বাণিজ্য কর নয়, ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য করও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, কোন কোন দ্রব্য, বিশেষত যেসকল দ্রব্য অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান থেকে আসতো এবং শাহ বন্দর দিয়ে রপ্তানি হতো তার জন্য দুই বার কর দিতে হতো। উৎপাদনস্থল থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে শহরে আনয়নকারী ক্ষুদে ব্যবসায়ীকে প্রথমবার কর দিতে হতো এবং ঢাকা থেকে দূরবর্তী বাণিজ্যিক কেন্দ্রে দ্রব্য রপ্তানিকারককে দ্বিতীয় বার কর দিতে হতো।[৩০] চতুর্থত, হুগলী বখ্‌শ বন্দরে কর প্রদানকারী বিদেশী কোম্পানিসমূহের প্রদত্ত আমদানি ও রপ্তানি কর সংগৃহীত সাইর–করের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্কের বিনিময়ে শাহ সুজার নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের কারণে ইংরেজ কর্মকর্তাগণ ও মুক্ত ব্যবসায়ীগণ ১৭৬২–৬৩ সালের দিকে প্রভাব বিস্তার করে শুল্ক ফাঁকি দিত। অতএব মুহাম্মদ রেজা খান কর্তৃক সংগৃহীত সাইরের হিসাবকে ঢাকার ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রকৃত নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, কিছু দলিলপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা থেকে সুতিবস্ত্র রপ্তানি সম্পর্কে সন্তোষজনক ধারণা প্রদান করে।

ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত সুতিবস্ত্র

সমগ্র মোগল আমলে বাংলার সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢকার সুতিবস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এবং বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানিপণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ঢাকার সামগ্রী। খ্রিস্টীয় প্রথম দিকের শতাব্দীগুলোতে ঢাকায় তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু সমগ্র মোগল যুগে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে ঢাকায় এ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে। বয়নশিল্প এ জেলায় এবং আশেপাশে সকল এলাকায় প্রত্যেক গ্রামে বিস্তারলাভ করে।[৩১] কিন্তু কোনো কোনো এলাকায় তাঁতিগণ অত্যন্ত বেশি পারদর্শিতা অর্জন করে এবং সেসব এলাকা মূলত সূক্ষ্ম মসলিনের উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সূক্ষ্ম মসলিনের জন্যই ঢাকা বিশ্বজোড়া

www.nagorikpathagar.org

খ্যাতি অর্জন করেছিল। বাংলায় মসলিন উৎপন্ন হতো ঢাকা, সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতবাদ্দি, জংগলবাড়ী ও বাজিতপুরে।[৩২]

ঢাকায় মোটা ও সূক্ষ্ম উভয় ধরনের কাপড় তৈরি হতো। মোটা কাপড় মূলত স্থানীয় জনসাধারণ এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য তৈরি হতো। সূক্ষ্ম কাপড়, যাকে মসলিন বলা হতো, প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ব্যবহার এবং রপ্তানির জন্য তৈরি হতো। সূক্ষ্ম মসলিন বিভিন্ন ধরনের ছিল এবং এগুলোর নামকরণও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। *যেমন মলমল, তানজেব* (দেহের ভূষণ), *নয়নসুখ* (চোখের শান্তি), *চিকন* (পাতলা বা সূক্ষ্ম), *চারকোণা* (বর্গাকৃতি অথবা চারকোণায় অলংকরণকৃত), *আব-ই-রওয়ান* (প্রবাহিত পানি), শবনম (ভোরের শিশির), *জংলী খাসা* (জংগলববাড়িতে তৈরি খাস দ্রব্য), *ডোরিয়া* (ডোরাকাটা বা নানা বর্ণের রেখাযুক্ত), জামদানি (পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত) এবং বুটি (গ্রন্থিযুক্ত নকশাখচিত)।[৩৩] এসমস্ত বস্ত্র সম্রাট এবং বাংলার নবাবদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। যে মসৃণ বস্ত্র সম্রাটের জন্য সংরক্ষিত থাকতো তাকে মালবুস খাস এবং যে মসৃণ বস্ত্র নবাবের জন্য সংরক্ষিত থাকতো তাকে *সরকার-ই-আলী* বলা হতো। *সরকার-ই-আলী* জগৎ *শেঠ* পরিবারের জন্যও সংগ্রহ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে তা পৃথক ধরনের কোন বস্ত্র নয়, বরং তা হলো সূক্ষ্মতম বস্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে তা *মালবুস খাস, মলমল খাস* নামে পরিচিতি লাভ করে এবং *মলমল খাস ও সরকার-ই-আলী* ছিল দুটো বিশেষ ধরনের বস্ত্রের নাম।

সম্রাট এবং বাংলার নবাবের জন্য মসৃণতম বা সূক্ষ্মতম মসলিন সংগ্রহের জন্য মোগল সরকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করতো, যাকে *দারোগা-ই-মালবুস খাস ওয়া তাঁতখানা* বলা হতো। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন বস্ত্র তৈরির কারখানায় তাঁতসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যাতে করে তাঁতিরা বয়নে ও সূক্ষ্মতায় তৈরি বস্ত্রের সঠিক মান রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের সংস্থাপনাকে *মালবুস খাস কুঠি* বলা হতো এবং এটা ছিল এক ধরনের মোগল কারখানা। এ কারখানা সরকারি কর্মচারী দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করা হতো এবং তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত কর্মচারীগণ সরাসরি ঢাকা শহরে বসবাসকারী *দারোগা-ই-মালবুস খাসের* অধীনে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করতো। দুইজন *দারোগা-ই-মালবুস খাসের* নাম আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাঁদের একজন হলেন শ্রীনাথ (সম্ভবত ভূলবশত ছোটেনাথ উচ্চারণ করা হয়), যিনি ১৭২৩ থেকে ১৭২৬ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অপরজন হলেন সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ (অথবা মাহমুদ), যিনি ১৭৩৬ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩৪] শেষোক্ত ব্যক্তির সময়কালে তিনি সালিহ মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রতিনিধি *মালবুস খাস ও সরকার-ই-আলী* বস্ত্র বয়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন যেন তাঁতিরা বাংলার নবাব এবং সম্রাটকে প্রতারিত করতে না পারে। কিন্তু এই কর্মকর্তা শহরের তাঁতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা আদায় করতেন এবং একই পদ্ধতিতে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের কাছ থেকেও তত্ত্বাবধান করার নামে অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করতেন। তখন রুফোগার ও নুরদিয়াদের কোম্পানির অধীনে কাজ না করার জন্য আদেশ দেওয়া হতো। এই অজুহাতে এই আদেশ দেওয়া হতো যে, কোম্পানির অধীনে কাজ

www.nagorikpathagar.org

করলে সম্রাট ও নবাবের বস্ত্র তৈরির কাজ ব্যাহত হবে। এজন্য আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগের বিবরণ ঢাকাস্থ ইংরেজ কোম্পানির কার্যবিবরণীতে আছে।[৩৫] যাই হোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পর দারোগার অফিস এবং তাঁর সংস্থাপনা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তার *মালবুস খাস অথবা সরকার-ই-আলীর* সরবারহ বন্ধ হয়ে যায়।[৩৬] অতি সূক্ষ্ম মসলিন অতি অল্প পরিমাণে তৈরি হতো, কারণ তা তৈরি করতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো এবং অত্যন্ত সুদক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হতো। তা কেবলমাত্র সম্রাট এবং বাংলার নবাব ও তাঁদের পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হতো। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলরের এক পত্রে জানা যায় যে, নিম্নোক্ত পরিমাণ মসলিন মুর্শিদকুলী খান (যিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন এবং ১৭২৭ সালে ইন্তেকাল করেন) প্রতি বছর সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন : [৩৭]

মালবুস খাস

ঢাকার আড়ং হতে

প্রতিটি ২৫০ টাকা মূল্যের ১০০টি জামদানি কাপড় অথবা পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত সমপরিমাণ বস্ত্র	টাকা ২৫,০০০.০০
মেরামত বা রিপুকরণ ও ধোলাই খরচ ইত্যাদি	টাকা ১,০০০.০০
প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যের ৫০টি রিপুকরা পুষ্পিত চিকন সিল্ক	টাকা ১,০০০.০০
ধোলাই ও মেরামত বা রিপু করার খরচ ইত্যাদি	টাকা ২৮০.০০
প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৬০ খণ্ড রেজা (অথবা ছোট টুকরা) রৌপ্য- পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত	টাকা ৬,০০০.০০
ধোলাই ও মেরামত বা রিপুকরণ খরচ ইত্যাদি	টাকা ২০০.০০

খাসনগর (সোনারগাঁও) আড়ং হতে

প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যের সাধারণ মসলিন বস্ত্রের ১০০ খণ্ডের দাম	টাকা ২০,০০০.০০
ধোলাই খরচ ও মেরামত বা রিপুকরণ খরচ ইত্যাদি	টাকা ২,৮০০.০০
প্রতিখণ্ড ৮০ টাকা মূল্যের ২০টি সরবন্দের খরচ	টাকা ১,৬০০.০০
ধোলাই খরচ ও মেরামত বা রিপুকরণ খরচ ইত্যাদি	টাকা ১৫০.২৫

বাজিতপুর আড়ং হতে

প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যের ১০০ খণ্ড সাধারণ মসলিনের মূল্য	টাকা ২০,০০০.০০
ধোলাই খরচ ও মেরামত বা রিপুকরণ খরচ ইত্যাদি	টাকা ১,০৫০.৭৫

জংগলবাড়ি আড়ং হতে

প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০০ খণ্ড সাধারণ মসলিনের মূল্য	টাকা ১০,০০০.০০
ধোলাই ও মেরামত বা রিপুকরণ খরচ ইত্যাদি	টাকা ১,০০০.০০
	সর্বমোট টাকা ৯৯,০৮১.০০

www.nagorikpathagar.org

স্থানীয় ব্যবহারের জন্য তৈরি মোটা কাপড় ছাড়া অন্যান্য কাপড় ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ এবং বিদেশী বণিকরা রপ্তানি করতো। ইংরেজ কোম্পানি এবং তার কর্মচারীদের দ্বারা রপ্তানিকৃত বস্ত্রের কয়েক বছরের হিসাব ঢাকাস্থ ইংরেজ ফেক্টরি রেকর্ডে পাওয়া গেছে এবং তা নিম্নরূপ : [৩৮]

বছর	ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক রপ্তানি বাবদ অর্থের পরিমাণ	কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক রপ্তানি বাবদ অর্থের পরিমাণ
১৭৩৬–৩৭	টাকা ২,২২,৩৬৬–৩–৩	টাকা ৫৯,০০৯–১০–৬
১৭৩৭–৩৮	টাকা ৩,৪৮,৯৬২–১৫–৬	টাকা ২,১২,৪৩৭–৫–৯
১৭৪৩–৪৪	টাকা ৫,৬৭,৭৯১–৩–০	টাকা ২,০৬,৮২২–৭–৯
১৭৪৪–৪৫	টাকা ৫,৬৬,৬২৭–১৪,০	টাকা ১,৩৩,০৬৮–৬–৯

১৭৪৭ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণ সুতিবস্ত্র ঢাকা থেকে রপ্তানি হয় :[৩৯]

সম্রাটের জন্য	টাকা ১,০০,০০
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য	টাকা ৩,০০,০০০
জগৎ শেঠের জন্য	টাকা ১,৫০,০০০
উত্তর ভারতের প্রদেশসমূহে ব্যবহার জন্য তুরানি বণিকদের দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ১,৫০,০০
বসরা ও জেদ্দার মতো বৈদেশিক বাজার এবং দেশী বাণিজ্যের দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ৫,০০,০০০
বসরা ও মক্কা এবং জেদ্দা বাজারে আর্মেনীয় বণিকদের বাণিজ্যের জন্য মোগল বণিক দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ৪,০০,০০০
দেশী বাণিজ্যের জন্য হিন্দু বণিক দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ২০,০০,০০
ইউরোপের জন্য ইংরেজ কোম্পানি দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ৩,৫০.০০০
বিদেশী বাজারের জন্য ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ২,০০০,০০০
ইউরোপের জন্য ফরাসী কোম্পানি দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ২,৫০,০০০
বিদেশী বাজারের জন্য ফরাসী বণিক দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ৫০,০০০
ইউরোপের জন্য ওলন্দাজ কোম্পানি দ্বারা রপ্তানিকৃত	টাকা ১,০০,০০০
সর্বমোট টাকা	২৮,৫০,০০০

ঢাকাস্থ কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলর উল্লেখ করেছেন যে ১৮০০ সালে ঢাকার সুতিবস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল প্রায় ২৬ লাখ টাকার মূল্যমানের সমপরিমাণ। তাঁর প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : [৪০]

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা	টাকা ৪,৫০,০০০
সোনারগাঁও	টাকা ৩,৫০,০০০
নারায়ণপুর[৪১]	টাকা ২,০০,০০০
জংগলবাড়ী, বাজিতপুর[৪২]	টাকা ৪,৫০,০০০
চাঁদপুর[৪৩]	টাকা ৫০,০০০
শ্রীরামপুর[৪৪]	টাকা ৫০,০০০
ধামরাই	টাকা ২,৫০,০০০
তিতবাদ্দি	টাকা ১,৫০,০০০
দেশী লোকদের ব্যবহারের জন্য নিম্নশ্রেণীর হিসাবের সম্ভাব্য স্বল্পতা বাবদ	টাকা ৪,৫০,০০০ টাকা ২,০০,০০০
	সর্বমোট টাকা ২৬,০০,০০০

১৭৪৭ সালে ঢাকাস্থ কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ঢাকায় উৎপাদিত সুতিবস্ত্র রপ্তানির যে হিসাব প্রদান করেছেন তা থেকে ১৮০০ সালে ঢাকায় সুতি-বস্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা– অনেক কম। এই পার্থক্য দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিদেশী সুতা আমদানির কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে দেশী তাঁতশিল্পের পতনের ফলে এরূপ ঘটতে পারে। দ্বিতীয়, চট্টগ্রাম ও হরিয়াল (আজকের পাবনা জেলায় অবস্থিত) এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত সুতিবস্ত্র[৪৫] মোগল আমলে শাহ্ বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হওয়ার কারণে ১৭৪৭ সালে রপ্তানি তালিকায় সুতিবস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব ১৭৪৭ সালে রপ্তানিকৃত উল্লিখিত সুতিবস্ত্রের পরিমাণ ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

টীকা

১. *বাহরিস্তান,* ভল্যুম–২, পৃ. ৬৪৪।

২. *Travels of Sebastian Manrique,* ভুল্যম–১, পৃ: ৪৪–৪৫।

৩. অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় প্রচলিত জটিল মুদ্রাপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His Times,* পৃ. ৯৩–৯৭।

৪. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম–৭, সংখ্যা–২, ১৯৬২, পৃ. ৩০৭–৩১২।

৫. *H. B.* পৃ. ৩২৩।

www.nagorikpathagar.org

৬. শিহাব-উদ্‌দীন তালিশ, *ফতিয়া-ই-ইবারিয়া, জে. এন.* সরকার কর্তৃক অনূদিত *Journal of the Asiatic Society of Bengal* এ প্রকাশিত, ১৯০৭, পৃ. ৪০৭।

৭. ১৭৬২-৬৩ সালে ফিরিঙ্গীবাজার থেকে সংগৃহীত সাইরের পরিমাণ ছিল ১৮১৫-১১-১০ টাকা (দেখুন, ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ডস, ভল্যুম-৪, ৩নং পরিশিষ্ট)।

৮. ব্রাডলী বার্ট *Romance of an Eastern Capital,* পৃ. ২৮৬।

৯. তুলনীয়, এ. এইচ. দানী *Dacca,* পৃ. ১৭১।

১০. টমাস বৌরী, *Countries Round the Bay of Bengal,* পৃ. ১৫০।

১১. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭ সংখ্যা-২, ১৯৬২, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

১২. এ. এইচ. দানী, *Dacca,* পৃ. ৪২।

১৩. *B.P.P.,* ভল্যুম-৪২, ১৯৩১, পৃ. ৪৮-৫৪।

১৪. ডবলিও ফস্টার সম্পাদিত, *The English Factories in India,* ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃ. ১৭১।

১৫. *Dacca Diaries, Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-১৬, ১৯২০, পৃ. ৯১।

১৬. *Dacca Diaries, Journal of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-১৬, ১৯২০, পৃ. ৯১ ; B.P.P. ভল্যুম-৩৩, ১৯২৭, পৃ. ৩১-৩২।

১৭. B.P.P, ভল্যুম-৩৩, ১৯২৭ পৃ. ৩২।

১৮. *Journal of Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুকম-১৬,১৯২০।

১৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *Early Annals of the English in Bengal,* ভল্যুম-১, গ্রন্থ ৩, অধ্যায় ১-৩।

২০. *B.P.C.,* ১৯ শে জানুয়ারি, ২৫ শে মার্চ, ১৭২৩।

২১. বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া হয়েছে।

২২. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-৩, *Consultation,* ১২ নভেম্বর, ১৭৫০।

২৩. তুলনীয়, কে.কে. দত্ত, *Alivardi and His Times,* পৃ. ১৮৭-১৯৫; এস. ভট্টাচার্য, *East India Company and the Economy of Bengal,* পৃ. ১৩৭।

২৪. *Home Miscellaneous Series,* ভল্যুম-৪৭।

২৫. *Dacc Factory Records,* ভল্যুম-২, ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৩৭।

২৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এ. ভট্টাচার্য, *East India Company and the Economy of Bengal,* পৃ. ১৬৭-১৭৪।

২৭. *Proceedings of the Dacca Provincial Council, Dacca Factory Records,* ভল্যুম-৪ এবং পরিশিষ্ট-৩।

২৮. জেসম টেলর, *A Descriptive and Historical Account of cotton manufacture of Dacca,* পৃ. ১৩২। তিনি লিখেছেন যে, ১৯৮৭ সালে ঢাকার মোট রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য ১

www.nagorikpathagar.org

কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং তার মধ্যে ঢাকা থেকে কেবল রপ্তানিকৃত সুতিবস্ত্রের মূল্য ২৫ লাখ টাকা। এ বক্তব্যের সমর্থনে কোনো প্রমাণ তিনি পাননি ; যদি এটা সত্য হয় তবে শাহ বন্দর হতে রপ্তানিকৃত ঢাকার দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও সত্য হতে পারে।

২৯. পূর্বের আলোচনা দেখুন।

৩০. পরিশিষ্ট-১০ এবং ১১-এর উপর একটি সূক্ষ্ম পরীক্ষা এ বক্তব্যকে প্রমাণিত করে। তা হলো, একটি দ্রব্যের উপর একাধিকবার কর আরোপিত হয়েছে। এই তথ্য আমরা ১৬৮৩ সালে কেন্দ্রীয় উজিরের কাছে লেখা শায়েস্তা খানের এক পত্র থেকে জানতে পারি। (*The Diary of William Hedges*, ভল্যুম-১, পৃ. ১০১)।

৩১. *A Descriptive and Historical Accounts of the Cotton Manufacture of Dacca*, পৃ. ৫।

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. বিলাতের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ঢাকাই মসলিনকে নিম্নলিখিত নামে শ্রেণীবিন্যাস করা যায় : (১) *চিকন* (কারুকাজ করা)-পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (২) *চারকোণা* (বর্গাকার ডিজাইন)—পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (৩) *আব-ই-রওয়ান* (নকশাবিহীন মসলিন) ; পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (৪) *সরকার-ই-আলী*-পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত; (৫) *শবনম*-, পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত; (৬) *তানজেব*-পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (৭) *নয়নসুখ*, গলাবন্দ-রুমাল হিসাবে ব্যবহৃত ; (৮) জংলীখাস-পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (৯) ডোরিয়া-শিশুদের পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (১০) জামদানি-পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (১১) বুটী-পোষাক তৈরিতে ব্যবহৃত ; (ফরবস ওয়াটসন, *The Textile Fabrics of India*, ভল্যুম-৮)। ১৮০০ সালে ঢাকার আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি আরও বেশি শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। যেমন-*কাজহাজী*, *বাফতে কাজহাজী*, *সরবুটী*, *মাহমুদিয়াতি*, *সরবন্দ*, *তারান্দাম*, *হাম্মাম*, *সরহন্দকোনা* ইত্যাদি। আরও জানার জন্য দেখুন, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, ভল্যুম-৭,সংখ্যা-২, ১৯৬২, পৃ. ৩২৪-৩২৬। মসলিনের বিস্তারিত শ্রেণীবিন্যাসের জন্য দেখুন, *A Descriptive and Historical Account of the Cottom Manufacture of Dacca*, পৃ. ৪৩-৪৮। বাংলা ভাষায় প্রণীত, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *ঢাকাই মসলিন* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. তুলনীয়, *B.P.C.*, ১ লা নভেম্বর ১৭২৩ ; ৩রা আগস্ট ১৭২৪ ; *Dacca Factory Records*, ভল্যুম-২, *Consultations*, ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৩৭, ৫ই জুন ১৭৩৭। এই কর্মকর্তা কখনও কখনও *দারোগা-ই-মালবুস খাস ওয়া তাঁতখানা* (রাজকীয় ব্যবহারের জন্য এবং বুনন কারখানার জন্য সূক্ষ্ম মসলিনের কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) পদবীতে পরিচিত হতেন।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাবে দেখা যায় যে, টাকা ৪৩,৫০৫-১৪-০ *মালবুস খাস সংগ্রহে ব্যয় হয়েছে।* (*Dacca Factory Records*, ভল্যুম-৬, পরিশিষ্ট-৩) ১৭৭২ সালে কমিটি অব সার্কিট *দারোগা-ই-মালবুস খাস ওয়া তাঁতখানার* বার্ষিক সংস্থাপনা খরচ বাবদ ২১৭৫ টাকা ব্যয় অব্যাহত রাখতে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, এ সংস্থাপনা যদি একবার ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে তা পুনঃস্থাপন করা অসম্ভব হবে।

www.nagorikpathagar.org

অতএব কোম্পানির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিল পুনর্নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসব লোকের বেতন দেওয়া হোক। *Proceedings of the Committee of Circuit at Dacca,* ভল্যুম-৬, পৃ. ৮৯।

৩৭. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, সংখ্যা-২, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

৩৮. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২, ১০ই জুলাই, ১৭৩৭ ; ৩রা মে, ১৭৩৮ ; ১লা জুন, ১৭৪৪ ; ৪ঠা জুন, ১৭৭৫।

৩৯. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, সংখ্যা-২, ১৯৬২, পৃ. ৩০৭-৩০৯।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

৪১. বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় (যদিও ত্রিপুরা লেখা আছে)।

৪২. বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলায় (যদিও মূল গ্রন্থে ময়মনসিংহ জেলা উল্লিখিত আছে)

৪৩. বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় (যদিও ত্রিপুরা জেলা নাম উল্লেখ আছে)।

৪৪. বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় (যদিও ত্রিপুরা জেলার নাম উল্লেখ আছে)।

৪৫. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, সংখ্যা-২, ১৯৬২, পৃ. ৩৩৩।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঢাকার অর্থনৈতিক জীবন

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনার প্রেক্ষিতে মোগল আমলে ঢাকার অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। তবে তার আগে তৎকালীন ঢাকায় বসবাসরত লোকসংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মোগল আমলে লোকসংখ্যার কোনো সরকারি হিসাব বর্তমানে বিদ্যমান নেই। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্য পাওয়া যায় সেবাসটিয়ান ম্যানরিকের বর্ণনায়। তিনি ১৬৪০ সালে ঢাকা নগরী ও তার উপকণ্ঠের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ নির্ধারণ করেন।[১] এ সম্পর্কে আরও দুটি তথ্য পাওয়া যায় মোগল শাসনের পরবর্তীকালে— একটি ১৭৮৬ সালে ঢাকার কালেক্টর কর্তৃক লিখিত পত্রে এবং অন্যটি ১৮০০ সালে কোম্পানির ঢাকাস্থ আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলরের লেখা ঢাকার বিবরণে।[২] ঢাকার কালেক্টর এবং আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি উভয়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দুই লক্ষ নির্ধারণ করেছেন। ম্যানরিক এবং ঢাকার কালেক্টরের হিসাব সম্পূর্ণ আনুমানিক। কিন্তু আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির হিসাব কম-বেশি আনুমানিক হলেও তা ১৮০০ সালে ঢাকার পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সম্পত্তির মালিকানার হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত। এ তিনটি তথ্যের কথা মনে রেখে এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে আনুমানিকভাবে মোগল আমলে ঢাকার লোকসংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

তাহলে ইসলাম খানের রাজধানী স্থানান্তরের সময় থেকেই শুরু করা যাক। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় একাধিক বার বাংলাকে ৫০,০০০ লোকের এলাকা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] সম্ভবত তিনি বাংলায় মোগল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বেসামরিক অফিসারদের মোট সংখ্যা ৫০,০০০ বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা একটি সাধারণ বিবরণ এবং তা কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না। মির্জা নাথন তাঁর *বাহরিস্তানে* যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা করার সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মনসবদারদের পদমর্যাদা এবং তাঁদের নিয়োজিত সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। নাথনের সাধারণ গাণিতিক হিসাবে অফিসারদের সংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার ছিল বলে মনে হয়। এ সংখ্যার সঙ্গে সংস্থাপনার অধস্তন কর্মচারী, তাঁবু, রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জামবাহক, হাতি ও ঘোড়ারক্ষক, নৌবহর, নৌসেনা ও অফিসারদের (এদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতো) গৃহপরিচারিকাদের সংখ্যাও যোগ করতে হবে। এমন দরাজভাবে হিসাব করলে এই সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ হাজার হতে পারে। যদি এ সংখ্যাকে মোগল শাসনের প্রাথমিক যুগের একটি পরিসংখ্যান হিসাবে ধরা হয়, তা হলে এর সঙ্গে আরও ৫০ থেকে ৬০ হাজার স্থানীয় লোক এবং আরও যারা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং

www.nagorikpathagar.org

মোগল সুবাদারদের সঙ্গে আগত দলবলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে শহরে ভিড় করেছিল তাদেরও যোগ করতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সংখ্যা যোগ করে দরাজভাবে হিসাব করলেও মোট সংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ হবে। সঠিক হিসাবে তা এক লক্ষের বেশি হবে না।

অতিরঞ্জিত সংখ্যা এড়ানোর জন্য ধরা যাক, মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক বছর ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত শহরের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা মনে রেখে বলা যায় যে, ১৬৪০ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের পরিধি দ্বিগুণ হয়েছিল। কাজেই শহরের লোকসংখ্যাও নিশ্চয়ই দ্বিগুণ হয়েছিল, যার অর্থ হলো, ১৬৪০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ এবং ঠিক এ কথাটাই সেবাসটিয়ান ম্যানরিক বলতে চেয়েছেন। ১৬৬০ সাল থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়টা শহরের প্রসারের এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধির যুগ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে আয়তনে ও গুরুত্বে সরকারি সংস্থাপনার অবনতি হয়। কিন্তু শহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব পূর্বের মতোই অটুট ছিল, এমনকি বৃদ্ধি পেয়েছিল বলা যায়। কাজেই এ সময় লোকসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল বলে মনে করা যায় না। লোকসংখ্যার তৎকালীন সরকারি বা আনুমানিক কোনো হিসাবই পাওয়া যায় না। যদি শহরের স্বাভাবিক প্রসারের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তা হলে লোকসংখ্যা হবে প্রায় ৮ লক্ষ এবং তা ১৬৪০ সালের লোকসংখ্যার চার গুণ। কিন্তু তা অতিরঞ্জিত হবে বলে মনে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে[৪] যে, যদিও উত্তর দিকে টঙ্গী পর্যন্ত শহর বিস্তৃত হয়েছিল, আম্বর সেতু ও টঙ্গীর মধ্যবর্তী এলাকার লোকবসতি নিশ্চয়ই হাল্কা ছিল। ১৭৮৬ অথবা ১৮০০ সালের লোকসংখ্যার হিসাবকেও শহরের প্রসারের চরম পর্যায়ের হিসাব বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ উক্ত সময়ের পূর্বেই শহরের অবনতি হয়েছিল, বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দিউয়ানি গ্রহণের পর। সুতরাং ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, ঢাকার সর্বোচ্চ উন্নতির যুগে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই ৪ থেকে ৫ লক্ষ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, চূড়ান্তভাবে হ্রাস পেয়েছিল ১৭৬৫ সালের পর, যার ফলে ১৭৮৬ অথবা ১৮০০ সালে এ সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে নেমে আসে।

জনগণের পেশাগত শ্রেণীবিন্যাস

ঢাকার অর্থনৈতিক জীবনের সাথে এই জনগোষ্ঠী কিভাবে মিশে গিয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।[৫] এখানে আমরা ঢাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য আয়ও জীবনযাত্রার মান মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে তাদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ করতে চাই। বিদেশী পরিব্রাজকদের মধ্যে সেবাসটিয়ান ম্যানরিক ঢাকার অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছুটা উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি শুধু শহরের ধনসম্পদ এবং সেখানকার বাজারে সহজলভ্য জিনিসপত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি, বরং সেখানকার অধিবাসীদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও আলোকপাত করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, অনেক বিচিত্র জাতি শহরে ভিড় জমাতো। কিন্তু এসব জাতি সম্পর্কে তিনি কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন খত্রী, শেঠ এবং মজুরদের (যারা উচ্চ বেতন বা পারিশ্রমিকের প্রতি আকৃষ্ট হতো) কথা এবং সাধারণভাবে উল্লেখ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন অসংখ্য অতিথির কথা, যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসতেন।[৬] ম্যানরিক ঢাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের পূর্ণ বিবরণ দেননি ; কারণ তিনি শাসকশ্রেণী, কারিগর, কারখানার মালিক এবং জমিদারশ্রেণী সম্পর্কে আদৌ উল্লেখ করেননি। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের বিবরণে বিশেষত যেসকল উপাদান ঢাকা শহরের প্রসারে অবদান রেখেছে সেগুলোর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোগল আমলে ঢাকার অধিবাসীদেরকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যেমন— ১. মোগল প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অফিসার ও তাঁদের পরিচালকগণ ; (২) ভূস্বামী ও তাঁদের পরিচালকগণ অর্থাৎ যারা জমির আয়ের উপর জীবনযাপন করতো ; (৩) বণিক ও ব্যবসায়ীগণ এবং তাঁদের পরিচালকগণ ; (৪) কারিগর, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও অন্যান্য পেশার লোকজন এবং (৫) শ্রমিক বা দিনমজুর শ্রেণী। এই শ্রেণীবিভাগকে শহরের জনগোষ্ঠীর সাধারণ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ বলে ধরে নিলে এটা বোঝায় না যে, এ রকম নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব ছিল। ব্যবসা বা জমি থেকে আয় করছে এ রকম অনেক লোক যথার্থই ব্যবসায়ী বা ভূস্বামী ছিল না, বরং শ্রমিক অথবা বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল। একইভাবে মোগল অফিসারদের পরিচালকরা প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। কিন্তু এ ধরনের শ্রেণীবিভাগে বড় অসুবিধা দেখা দেয় কারিগর, কারখানামালিক কিংবা অন্যান্য পেশাজীবী লোকদের বেলায়। একজন কারখানা মালিক অথবা কারিগর ছিলেন একই সময়ে বিক্রেতা এবং ক্রেতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূক্ষ্ম মসলিন বুনতো এমন একজন তাঁতি দিন ও রাত্রের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে বুনন কাজ করতো[৭] এবং বুনন কাজ শেষ করে অথবা অবসর সময়ে সে অন্য কাজও করতো। সূক্ষ্ম সুতা কাটার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং অন্যান্য জ্ঞানের অধিকারী যেসব অল্পবয়সী মহিলা দিন-রাতের একটা বিশেষ সময়ে সুতা কাটার কাজ করতো, তারা আবার গৃহিণী ছিল অর্থাৎ গৃহের সকল কাজও করতো।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বিবেচনা করা যায়। তা হচ্ছে, পেশাগত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকরা কোনো সঙ্ঘ বা সমিতিতে সংগঠিত ছিল কি-না। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন এলাকার নাম, যেমন শাঁখ রিটোলা, তাঁতিবাজার, যুগীনগর ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে, একই পেশার অনুসারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করতো। কিন্তু অন্য কারিগর এবং কারখানা মালিকরা সংগঠিত ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যের কারণেও কারিগররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই এলাকায় বসবাস করতো। কাজেই একে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারিগর ও কারখানা মালিকদের মধ্যে তাঁতিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা সাধারণত নিজ নিজ গৃহে বাস করতো এবং নিজ নিজ বাড়িতেই তাঁত স্থাপন করতো।[৮] মোগল অফিসার *দারোগা-ইমালবুস খাস ওয়া তাঁতখানা* কর্তৃক পরিচালিত *মালবুস খাস কুঠি* ছিল একমাত্র সংগঠিত শিল্প। কিন্তু এসবের উৎপাদন ছিল সীমিত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা হতো না। কুঠিতে যে তাঁতীরা কাজ করতো, শুধু তাদের উৎপাদিত কাপড়ের জন্য মূল্য দেওয়া হতো, যার অর্থ হলো, তারা বেতনভুক কর্মচারী ছিল না। ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীগণ এই অর্থে সংগঠিত ছিল বলা যায়। তারা তাদের মাতৃভূমির বণিকদের একটি কোম্পানির সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু তারা ঢাকার অন্য বণিকদের সঙ্গে কোনো সমিতি গঠনের জন্য সহযোগিতা

www.nagorikpathagar.org

করেনি। একইভাবে ভূস্বামী বা তাঁদের পরিচারকদেরও নিজস্ব কোনো সংগঠন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যায়ন

দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে ঢাকার অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা যায়— বাহির থেকে আনীত সম্পদসহ শহরের সাধারণ সম্পদ এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান। আমদানি-রপ্তানি, শহরের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত মালামাল, ব্যবসার উদ্দেশ্যে আগত বিপুল সংখ্যক দেশী ও বিদেশী বণিক, শহরে অবস্থানরত কর্মকর্তাগণ প্রভৃতি সবাই শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত প্রদান করে। বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত সোনা-রুপার বাট এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি উল্লিখিত বাস্তবতারই চিত্র তুলে ধরে। ঢাকায় প্রতি বছর কি পরিমাণ বিদেশী সম্পদ আমদানি হতো সে হিসাব জানার কোনো উপায় নেই। কারণ ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানি এবং বিদেশী বণিকদের রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় না। ইংরেজদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে ঢাকায় তাদের বিনিয়োগের পুরোটাই তারা স্বর্ণ এবং বাইরে থেকে আমদানিকৃত মুদ্রায় পরিশোধ করতো। কারণ ঢাকায় তৈরি যে জিনিসপত্র তারা রপ্তানি করতো সে তুলনায় তাদের আমদানিকৃত মালামালের চাহিদা দেশীয় বণিকদের কাছে কম ছিল। সাধারণত তারা কলিকাতা থেকে সিন্দুকভর্তি করে তাদের সঞ্চিত ধন দিয়ে আসতো এবং ঢাকার টাকশালে সেগুলো নিয়ে মুদ্রা তৈরি করতো। কিন্তু কখনও কখনও যদি সে সম্পদ সময়মতো না আসতো, তাহলে তারা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঢাকার ফেক্টরি রেকর্ড থেকে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত এ ধরনের দুটি ঋণ গ্রহণের ঘটনা জানা যায়। কোম্পানি ১৭৪৩ সালে ১,৪০,০০০ টাকা এবং ১৭৫০ সালে ৬৩,০৫০ টাকা ঋণ নিয়েছিল বলে জানা যায়। প্রচুর অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং প্রতি বছর ঢাকা থেকে এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করার বাস্তবতা থেকে বোঝা যায় যে ঢাকার সম্পদ বছর বছর বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাব থেকে জানা যায় যে ঢাকার উপর মোট রাজস্ব ধার্য করা হতো প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্যয় বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রতি বছর মোট জমার পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ লক্ষ টাকা অথবা তার সামান্য কম। সুতারং এতে বোঝা যায় যে, শুধু সুতিবস্ত্র রপ্তানিই (প্রতি বছরে ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশি) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ঢাকার উপর ধার্যকৃত রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। সুতা রপ্তানি করে যে অতিরিক্ত আয় এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করে যে আয় হতো, তা নিশ্চয়ই ঢাকার জন্য উদ্বৃত্ত ছিল এবং এর সিংহভাগই শহরে থাকার কারণ 'প্রসাশনিক সদর দফতর হিসেবে ঢাকা' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, রপ্তানি থেকে উদ্বৃত্ত আয় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনকারীদের নিকট চলে যেত। তা হলে একথাও বলা যায় যে, জমির উপর রাষ্ট্রের পাওনা সম্পূর্ণ অর্থ দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রজাদের নিকট থেকে আসতো। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে দেখা যায় যে, শহর সমৃদ্ধশালী ছিল। কিন্তু এটা চিত্রের এক

www.nagorikpathagar.org

দিক মাত্র। আসলে সাধারণ লোকের আয়ের তুলনায় তাদের জীবনাবস্থা নগরীর মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর কুক্ষিগত সম্পদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আয় নির্ধারণ

প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ সুবাদার, দিউয়ান, বখ্‌শি বা উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন মনসবদার থেকে শুরু করে লেখক (পাটোয়ারী), কেরানি ও গৃহভৃত্যসহ নিম্নমর্যাদার অফিসার পর্যন্ত কর্মকর্তা–কর্মচারীর আয়ের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বেশি এবং প্রকট। মনসবদার বা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অফিসারদের ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হতো, কিন্তু চাকর–নফরদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হতো। বড় মনসবদারদের আয় সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের জীবনযাপনপদ্ধতি ছিল রাজকীয়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন সুবাদারের আয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। শায়েস্তা খান বিপুল সম্পদ এক সাথে লাভ করেছিলেন যা আজকের দুনিয়ায় কদাচিৎ শোনা যায়। এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিদের হিসাবমতে এ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টাকা এবং তাঁর দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা এবং তা থেকে তাঁর দৈনিক ব্যয় ছিল প্রায় অর্ধেক।[১১] এই বিপুল অর্থ শুধু তাঁর বেতন (বা বরাদ্দকৃত ভূমি) থেকে আয় হতো না, বরং তাঁর ব্যক্তিগত বাণিজ্য থেকে আয়ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য সুবাদার, যেমন মীর জুমলা এবং আজিম–উশ–শানও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। যদি এসব উদাহরণ বিবেচনার বাইরে রাখা হয়, তবে জেমস গ্রান্টের হিসাবমতে সুবাদারের বার্ষিক বেতন ও ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০,৭০,৪৬৫ টাকা।[১২] উল্লিখিত সূত্র অনুসারে ১৭২৮ থেকে ১৭৩৪ সন পর্যন্ত ঢাকার নায়েব–নাযিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের বেতন ছিল ১,০০,১৪৫ টাকা[১৩] এবং ১৭৬৩–৬৪ সালে ২১ মাসে মুহাম্মদ রেজা খানের বেতন ছিল ১,৫৭,৫০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে ৭,৫০০ টাকা।[১৪] নিম্নপদের অফিসার, লেখক এবং পিওনদের বেতন সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। মুহাম্মদ রেজা খানের আমলের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের একটি পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিবরণে বিভাগওয়ারী মোটামুটি হিসাব দেখানো হয়েছে। তাই এর দ্বারা কারো ব্যক্তিগত বেতন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডে কোম্পানির লেখক ও অন্যান্য বেতনভুক কর্মচারীদের সঠিক বেতনের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় :

১৭২৩ সালে ঢাকার কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কলিকাতা কাউন্সিল ঢাকা কুঠির জন্য নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় অনুমোদন করে : [১৫]

ব্যবস্থাপনা ব্যয় :

জন স্ট্যাকহাউজ	৪০/– টাকা প্রতি মাসে
হামফ্রেস কোল	২০/– ”
এডওয়ার্ড রেন্ডস	২০/– ”
টমাস কুক	২০/– ”
স্যামুয়েল গ্রীনহীল	২০/– ”

www.nagorikpathagar.org

উইলিয়াম ডেভিস	২০/-	”
নাথানিয়েল হল	২০/-	”
চীপের জন্য একটি ঘোড়া	৯/-	”
২ জন্য চাবদার	৬/-	”
ধোপা	৪/-	”
নাপিত	২-৮	”
gurryallys (?)	৬/-	”
ফরাস	৪/-	,,
পতাকা বহনকারী	২-৮/-	”
২ জন মালি	৪/-	”
১ জন মিরদা	৩/-	”
খিদমতগারগণ	১২/-	”
কাহারগণ (পালকি বাহক)	১২/-	”
ঝাড়ুদার	৫/-	”
মশালচী (যে ব্যক্তি বাতি জ্বালায়)	২/-	”
বাবুর্চি ও খাদ্য তত্ত্বাবধানকারী	১০/-	”
উকিল বা প্রতিনিধি	৫০/-	”

১৭৪৫ সালে ইংরেজরা ঢাকা কুঠিতে নিম্নোক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করেছিল এবং তাদের নামের পাশে তাদের নিম্নরূপ বেতনও উল্লেখ করা হয়[১৬]:

মানিক চাঁদ, ওভারসিয়ার ও প্রধান শর্টার	১০০/- টাকা প্রতি মাসে
মনেশ্বর রাম, শর্টার	২০/- টাকা প্রতি মাসে
গরীবউল্লাহ ঐ	২০/- টাকা প্রতি মাসে
হিসাবরক্ষক	
বল্লভ তেওয়ারী	১৭/-টাকা প্রতি মাসে
ভুনু (?)	১৫/- টাকা প্রতি মাসে
লেখক (কেরানি)	
গরীব বখ্শ	১০/-টাকা প্রতি মাসে

www.nagorikpathagar.org

গুজর মল	১০/– টাকা প্রতি মাসে
ভিকান মল (?)	৭/– টাকা প্রতি মাসে
রাম রাম সেন	৬/– টাকা প্রতি মাসে
গুরু দয়াল	৫/–টাকা প্রতি মাসে

রপ্তানি-পণ্যাগারের কর্মচারীগণ

ফকিরচাঁদ তেওয়ারী (প্রধান বানিয়া)	২১/–টাকা প্রতি মাসে
মনি রাম	১৫/– টাকা প্রতি মাসে
পুরান মল	১৫/–টাকা প্রতি মাসে
যুগরাজ	১৫/–টাকা প্রতি মাসে
রাম প্রসাদ	১৫/–টাকা প্রতি মাসে
ঠাকুর দাস	১০/– টাকা প্রতি মাসে
কালু তেওয়ারী	১০/–টাকা প্রতি মাসে
মানিক মার্কার	৭/–টাকা প্রতি মাসে

তেজগাঁওতে লেখক

ভোলা দাস	১০/– টাকা প্রতি মাসে
সংকর	৪/–টাকা প্রতি মাসে
চিকন দাস কোটা কর্মচারী	
রামা কান্ত	১০/–টাকা প্রতি মাসে
কৃষ্ণ পাল	১০/–টাকা প্রতি মাসে

গোমস্তাগণ

বালীনাথ, সোনারগাঁও	১০/–টাকা প্রতি মাসে
পদাধর সেন	১০/–টাকা প্রতি মাসে

বখশিখানাতে কর্মচারী

অত্মারাম, বানিয়া	১৫/–টাকা প্রতি মাসে
ব্রিদজো, সহকারী	১০/– টাকা প্রতি মাসে

www.nagorikpathagar.org

ভনজ রাম, লেখক	৪/-টাকা প্রতি মাসে
পরশুরাম, তেজগাঁওতে কর্মরত	৪/-টাকা প্রতি মাসে

উকিল বা প্রতিনিধি

ঠাকুর দাস, নবাবের দরবারে নিযুক্ত	৫৫/-টাকা প্রতি মাসে
ইউনুস মোহাম্মদ, তাঁতখানায় নিযুক্ত	৮/-টাকা প্রতি মাসে
বশির মাহমুদ শের, আমিন	৮/-টাকা প্রতি মাসে
চাঁদ খান, কাজীর দরবারে নিযুক্ত	৮/-টাকা প্রতি মাসে
পন্ডিত রাম, আগা বাকের এবং আলমগঞ্জ	৮/-টাকা প্রতি মাসে
হরি বল্লাহ মুন্সি	১৫/-টাকা প্রতি মাসে
শোকর উল্লাহ, ফেক্টরির জমিদার	৮/-টাকা প্রতি মাসে

উপর্যুক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন বেতন দেওয়া হতো লেখককে এবং তা ছিল মাসে ৪ টাকা মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায় যে, শর্টার (বাছাইকারী), মার্কার (চিহ্নদানকারী), বানিয়া ও গোমস্তা ইত্যাদি পেশাদার লোকরা লেখকদের চেয়ে উচ্চ বেতন পেত। সরকারি আনুকূল্য লাভের কলাকৌশল ও দাপ্তরিক কায়দাকানুন উকিলদের জানার প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁদের উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা হতো। নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন ছিল সর্বনিম্ন। একজন চাবদার (আর্দালী) ৩ টাকা, ধোপা ৪ টাকা, নাপিত ২$\frac{১}{২}$ টাকা, ফরাস ৪ টাকা, পতাকাবাহক ২$\frac{১}{২}$ টাকা, মৃধা ৩ টাকা, কাহার ৩ টাকা ও মশালবাহী ২ টাকা বেতন পেত। বাবুর্চি ও ঝাড়ুদারদের বেতন পৃথক করা যায় না। কারণ তাদের কয়েকজনের বেতন একত্রে এক বিবরণে দেখানো হতো এবং পৃথক পৃথক বেতন নির্দেশ করা হতো না। অন্য একস্থানে একজন ঝাড়ুদারের বেতন মাসে ১ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ পিওন ও অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীদের বেতন মাসে ২ টাকার কম ছিল না।

মোগল সরকারি দপ্তরে কর্মরত কায়কর্মী এবং মোগল কর্মকর্তাগণ কত বেতন পেত তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য আমরা তা নির্ধারণ করতে পারছি না। যুক্তি দেওয়া যায় যে, বিদেশী বণিকরা স্থানীয় কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ব্যাপারে উদার ছিল। কিন্তু এ ধরনের অনুমান যুক্তিযুক্ত হবে না এজন্য যে, আমাদের কাছে প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য আছে, যাতে জানা যায় যে, বিদেশী বণিকরা স্থানীয় রীতিনীতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল এবং তারা কখনো কখনো চার আনা বাঁচানোর জন্যও দরকষাকষি করতো।[১৮] যদি ধরে নেয়া হয় যে, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং বিদেশী বণিকরা উচ্চতর বেতন দিত, তবু বলা যায়, মোগল কর্মচারীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল। তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা তাৎক্ষণিকভাবে দূর করা হবে বলে এবং অবিচারের প্রতিবিধান করা হবে বলে আশা করতে পারতো এবং

www.nagorikpathagar.org

অন্যদের উপর জোর খাটাতে পারতো। মোগল আমলে একটা সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কর্মকর্তারা তাদের নাগালে যেকেউ আসতো তার কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতো। কেবল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নয়, একজন সাধারণ পিওনও সুযোগ পেলে উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো পিওন কোনো বেসরকারি ব্যক্তির কাছে কোনো পত্র দিতে যেত, তখন সেই পিওনও একটি উপহার প্রত্যাশা করতো। আধুনিক যুগে একে ঘুষ বলা হয়। কিন্তু মোগল আমলে এটি ছিল পুরোপুরি বৈধ। ইংরেজদের দলিলদস্তাবেজে এই রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, ইংরেজরা কেবল মোগল কর্মকর্তাদেরকে উপঢৌকন দেয়নি, বরং তাদের চাকরদেরও নানা উপঢৌকন দিত।[১৯] যাই হোক, এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, চাকর-নফরেরা সকল লোকের কাছ থেকে একই সুবিধা গ্রহণ করতো। কিন্তু একথা বলা যায় যে, এরূপ রীতি তখন প্রচলিত ছিল। কাজেই উপরে বর্ণিত তথ্যের আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ঢাকাস্থ ইংরেজ কোম্পানি স্থানীয় কর্মচারীদের যে বেতন দিত তাকে আলোচ্য সময়ে প্রচলিত হারে বেতন বলে গণ্য করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা মূলত জমির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতো, তাদের আয়েও তারতম্য ছিল খুব বেশি। জমিদারেরা রায়তদের থেকে সংগৃহীত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ সরকারি তহবিলে জমা দানের পরে বাকি অংশ নিজেরা গ্রহণ করতেন, এই অংশ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের খরচ বহন করতেন এবং নায়েব, মুন্সি, পাটোয়ারী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন দিতেন। বন্যা, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব সংগ্রহ হতো কম। তখন জমিদারদের আবেদনক্রমে ধার্যকৃত সরকারি রাজস্বের পরিমাণ কমানো হতো।[২০] জমিদারদের প্রকৃত আয় কত ছিল তা নির্ধারণ করা যায় না এবং এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা তাদের প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসনের শুরুতে জমিদারদের জমির প্রকৃত মূল্য এবং তা থেকে জমিদার কত টাকা আয় করেন তা জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কোম্পানি ব্যর্থ হয়[২১]।) গঙ্গামন্ডল পরগনার (বর্তমানে কুমিল্লা জেলায়) জমিদার জহুর-উন-নিসা ১৭৭৪ সনে যখন মারা যান, তখন তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মোকদ্দমা হওয়ার কারণে ঢাকা শহরে তাঁর বসতবাড়ি জরিপ করে সম্পত্তির একটি তালিকা তৈরি করা হয়। সেই তালিকা এবং বাড়ির বর্ণনা পরিশিষ্ট-১২তে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দলিলসমূহের মধ্যে এটাই একমাত্র দলিল, যা থেকে একজন মাঝারি ধরনের জমিদারের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ১৭৬২-৬৩ সনে জহুর-উন-নিসা সরকারকে ৪৬,৫৭২ টাকা ৪ আনা ২ পয়সা ২ পাই রাজস্ব প্রদান করেন।[২২] তাঁর বাসভবনের বর্ণনা এবং এর আসবাবপত্রের তালিকা এ ধরনের ধারণা প্রদান করে যে, এই জমিদার পরিবার অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতো। জমিদার ছাড়া আরও অনেকে ভূমির আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। যেমন নায়েব, গোমস্তা, তহশিলদার, উকিল, পাটোয়ারী এবং আরো অনেকে। তথ্যের অভাবে এসকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক কর্মচারীদের প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ দেখে ধারণা করতে পারি যে কর্মচারীদের যে বেতন দেওয়া হতো তার মধ্যে তারতম্য ছিল অত্যন্ত বেশি। যেমন যেখানে একজন নায়েব কয়েক শত টাকা বেতন পেতেন (অবশ্য এটা জমিদারির আয়তন বা

www.nagorikpathagar.org

ধরনের উপর নির্ভর করতো), সেখানে আনুমানিক দশ টাকা বেতন পেতেন, লেখক এবং প্রায় দুই টাকার মতো বেতন পেতেন পিওন এবং অনুরূপ শ্রেণীর কর্মচারীগণ। যাই হোক, তখনকার দিনে একটা সাধারণ রেওয়াজ ছিল এই যে, জমিদারগণ গৃহভৃত্য হিসেবে বহু দাস রাখতেন।

তৃতীয় দলভুক্ত জনগোষ্ঠী, যারা ব্যবসা–বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো তাদের আয়ের পরিমাণও নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ব্যবসার লাভ, যা সব সময় উঠানামা করতো এবং তা ছিল অনির্দিষ্ট উপাদান। যেসব দালাল ও পাইকার কোম্পানির নিকট মালামাল সরবরাহ করতো, তারা দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা নিম্নলিখিত হারে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করতো[২৩] :

দালালি	টাকা ৩.২ শতাংশ
পাইকারি	টাকা ৩.২ শতাংশ
দস্তুরি	টাকা ১.৯ শতাংশ
	টাকা ৭.১৩ শতাংশ

দালাল ও পাইকারেরা তাঁতিদের কাছ থেকে নিম্নবর্ণিত হারে কমিশন গ্রহণ করতো :

আড়তদারি	টাকা ৩.২ শতাংশ
বাটা	টাকা ১.৯ শতাংশ
মুকিম ও রিফুগার্স	টাকা ১.৯ শতাংশ
কেরানির পাওনা	টাকা .৮ শতাংশ
ছুটির দিন	টাকা .৫ শতাংশ
চাঁদা	টাকা .৩ শতাংশ
মোট টাকা	৭.৪ শতাংশ

সুতরাং যে দালাল বা পাইকার ১৩১১ টাকার (এ সংখ্যাটা এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, ১৭৩৬ সনে সরবরাহকৃত দ্রব্যের জন্য পাইকার ইংরেজদের কাছ থেকে এ পরিমাণ টাকা গ্রহণ করেছে) দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করেছে, সে পুরো এক মৌসুমে প্রায় ২০০ টাকা আয় করেছে। কিন্তু এটা তার সামগ্রিক আয়ের সূচক নয়, কারণ একই মৌসুমে সে তার সামর্থ্য অনুসারে অন্যান্য ব্যবসা করেও আয় করতে পারতো।

উৎপাদক এবং অন্যান্য করিগরের আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করাও কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু ১৮০০ সনে ঢাকাস্থ কোম্পানির আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলর প্রণীত ঢাকার বিবরণ আমাদেরকে মসলিন বুননকারী তাঁতিদের আয়ের পরিমাণ জানতে সাহায্য করে। সম্রাটের জন্য তৈরি একখানা মসলিন, যাকে *মালবুস খাস* বলা হয়, তাঁর মূল্য ২৫০ টাকা। টেলর আরও বলেন যে, যদিও সম্রাট এরূপ একখানা কাপড়ের জন্য ২৫০ টাকা বরাদ্দ করেন, তবু বাংলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা তাঁতিকে কখনও ১৫০ টাকার বেশি প্রদান করেনি।[২৪] ঢাকাস্থ মোগল কর্মকর্তার এ ধরনের অসদাচরণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। তাদের এ ধরনের আচরণ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল না। কারণ এ ধরনের আচরণ করার মতো অবস্থা স্থায়ী থাকলে মোগল আমলে মসলিনের যে উন্নতি হয়েছিল তা কখনও হতো না। একখানা মসলিন তৈরি করতে একজন তাঁতিকে দুইজন সহকর্মীসহ পুরো এক বছর কাজ করতে

www.nagorikpathagar.org

হতো এবং তার জন্য প্রতি তোলা (sicca weight) ৪/৫ টাকা মূল্যমানের ২০/২১ তোলা সুতার প্রয়োজন হতো। অতএব একখানা *মালবুস খাস* তৈরি করতে প্রায় ১০০ টাকা খরচ হতো এবং তার বিনিময় একজন তাঁতি ও দুইজন সহকারী সারা বছর কাজ করে ১৫০ টাকা নিট মুনাফা অর্জন করতো। অর্জিত মুনাফার সিংহভাগ অবশ্যই তাঁতি গ্রহণ করতো।[২৫] ধরুন, তাঁতি গ্রহণ করতো ১০০ টাকা এবং দুইজন সহকারীকে দিত ৫০ টাকা। অতএব মসলিনের একজন তাঁতি, যিনি দেশের সর্বোচ্চ দক্ষ কারিগর তাঁর ব্যাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০ টাকা অথবা মাসিক প্রায় ৮ টাকা মাত্র। ১৮০০ সনে টেলর তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত আধখানা মসলিন নিয়েছিলেন ৮০ টাকা দিয়ে। তা প্রস্তুত করতে একজন তাঁতি ও দুইজন সহকারীর ছয় মাস সময় লেগেছিল এবং তাঁরা এতে ৪১ টাকা মুনাফা অর্জন করেছিলেন।[২৬] অর্জিত মুনাফা হতে যদি তাঁতি[২৫] টাকা গ্রহণ করতেন, তা হলে তাঁর মাসিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ টাকা মাত্র। দেশের দক্ষ কারিগর হচ্ছে মসলিনের তাঁতি। তাঁর আয়ের পরিমাণ যদি এই রকম হয়, তবে অন্যান্য কারিগরের আয়ের পরিমাণ কি রকম হবে তা যে কেউ সহজে অনুমান করতে পারবেন।

পঞ্চম দলভুক্ত জনগোষ্ঠী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর আয়ের পরিমাণও জানা যায়নি। উপর্যুক্ত তাঁতির সহকারীদেরকে যদি শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত মনে করা হয়, তাহলে তাদের মাসিক আয়ের পরিমাণ কখনও দুই টাকার বেশি নয়, বরং তার চেয়ে কম। মোগল আমলে এবং তার পরেও এরকম অসংখ্য নজির পাওয়া যায় যে, চাষীরা অনেক সময় দাস ক্রয় করে তাদেরকে কৃষিকাজে এবং তাদের গৃহকর্মে নিয়োজিত করতো।[২৭] এ অবস্থা যে, শহরেও প্রচলিত ছিল না এ রকম ধারণা করার কোনো কারণ নেই। দাসপ্রথা প্রচলিত থাকার তথ্য এ কথা প্রমাণ করে যে, অদক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। যেকোনো অবস্থাতেই দিনমজুরদের মাসিক আয় ২ টাকার বেশি ছিল না। যাই হোক, একথা স্বীকার করতে হবে যে ঢাকা শহরের ব্যবসা–বাণিজ্যের বিকাশমান অবস্থার কারণে দিনমজুরদের কাজের নিশ্চয়তা ছিল। উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। নবাব এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তার কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, জমিদারগণ অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করতেন। এ প্রসঙ্গে জহুর–উন–নিসার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পরিশিষ্ট ১২–তে দেখা যায় যে, তাঁর দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার, বিভিন্ন ধরনের পরিধেয় বস্ত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ছিল। নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যুর পর গৃহের মূল্যবান সামগ্রী এবং ধনসম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁর বাড়িতে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা তিনটা উঠান ছিল। এর প্রবেশদ্বারে রক্ষীদের কক্ষ ছিল এবং বাড়ির অভ্যন্তরে ছিল বুয়ুতাত দালান (শয়নকক্ষ), শিশিবন্দী দালান, দিউয়ানখানা (দীউয়ানের দপ্তর), বালাখানা (আনন্দভবন), দেওরী দালান (দর্শনার্থীদের কক্ষ) এবং রান্নাঘর। এধরনের পরিকল্পনায় বাড়ির মালিকের সচ্ছলতার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু আমরা নিম্ন আয়ের সাধারণ জনগোষ্ঠীর আয় নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। যেসব মানুষ মাসিক দুই টাকা আয় করতো তাদের অবস্থা কেমন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের সূচক পরীক্ষা করতে হবে। এ একটি সাধারণ জ্ঞানেরই কথা যে, শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এ অবস্থা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ অর্থাৎ ১৭৩৯–৪০ সনে নবাব সরফরাজ খানের

www.nagorikpathagar.org

সুবাদারিকালেও বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েক বছরের দ্রব্যমূল্যের রেকর্ড রেখেছেন ঢাকাস্থ ইংরেজ বণিকরা। এই দ্রব্যমূল্যের তালিকা পরিশিষ্ট–১৩এ সংযোজন করা হয়েছে এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। এ প্রসঙ্গে চালের উদাহরণই যথেষ্ট, কারণ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এক টাকায় প্রায় ১$\frac{১}{৪}$ মন সাধারণ চাল পাওয়া যেত। একজন লোক যে মাসে মাত্র দুই টাকা আয় করে সে সারা মাসের আয় দিয়ে মাত্র তিন মণ চাল ক্রয় করতে পারে এবং যদি তাকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট (যাকে আদর্শ পরিবার হিসেবে গণ্য করা হয়) একটি পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয় তাহলে সে তার পরিবারের জন্য কেবল যথেষ্ট চাল সংগ্রহ করতে পারবে। অতএব এর অর্থ হচ্ছে, সে সারা জীবন অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে থাকবে। একথা আগেও বলা হয়েছে যে, দিনমজুরদের আয়ের পরিমাণ তার চেয়েও কম। সুতরাং অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, সাধারণ মানুষ, দিনমজুর এবং সর্বনিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

সাধারণ মানুষের জীবনাবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। সুখের কথা এই যে, মোগল শাসকরা দুর্যোগের সময় সচেতনভাবে মানুষকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাঁদের সাধারণ রীতি ছিল প্রয়োজনের সময় রায়তদের তাকাভী ঋণ (কৃষিঋণ) প্রদান[২৮] এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব মওকুফ করা।[২৯] মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাবের খতিয়ান থেকে নিম্নলিখিত খরচের খাতসমূহ উল্লেখ করা হলো[৩০]:

দরিদ্রদেরকে দান	টাকা ৫,৭০০–০–০–০
দার–উস–শিফা বা দরিদ্রের ঔষধ বাবদ খরচ[৩১]	টাকা ৩০৩৭–৪–০–০
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান	টাকা ৮৯১–০–০–০
তেজগাঁও পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের খরচ	টাকা ২৫৮০–৮–০–০
মহরম মাসে হোসেনী দালান আলোকিতকরণ এবং দরিদ্রদের দান বাবদ খরচ	টাকা ৮৮৫৮–৪–১৫–০

জেমস টেলর লিখেছেন যে, মোগল সরকার ঢাকায় একটি মাদ্রাসা পরিচালনা করতো এবং এটি ১৭৫০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এটি লালবাগ শাহী মসজিদের আওতাভুক্ত ছিল।[৩২] উল্লিখিত খরচসমূহের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ। কিন্তু মোগল সরকারের জনহিতকর কার্যাবলী সত্ত্বেও মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অনেক দুঃখ–দুর্দশা। অবশ্য মোগল যুগে আধুনিককালের জীবনের সুবিধাসমূহ (যেমন পানিসরবরাহ, বিদ্যুৎসরবরাহ অথবা পয়ঃপ্রণলীর সুবিধা) কেউ আশা করতে পারতো না। তখন সুলভ পরিবহণেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অবস্থাপন্ন উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঘোড়া এবং পালকি ব্যবহার করতেন। যদিও ভারতে মোগলদের পরিবহণ হিসাবে গরু বা মহিষের গাড়ির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়, তবু ঢাকায় মানুষের যাতায়াত অথবা মাল পরিবহণের জন্য গরু বা মহিষের গাড়ির ব্যবহার সম্পর্কে কোনো তথ্য আমরা পাইনি। সাধারণত স্থলপথে পায় হেঁটে চলাচল করাটাই রীতি ছিল। উইলিয়াম হেজেস অভিযোগ করেছেন যে, নবাবের সদর দফতর (আধুনিক বাবুবাজারের

www.nagorikpathagar.org

কাছে) এবং ইংরেজ কুঠির (তেজগাঁও-এ অবস্থিত) দূরত্ব ছিল প্রায় তিন মাইল।[৩৩] জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াত অনেক সহজ ছিল। শহরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নৌকার ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত, যদিও শহরের মধ্যে অনেক জলপথ ছিল।

মোগল যুগে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকার অধিবাসীরা মুদ্রা প্রচলন নিয়ে আরেক অসুবিধার সম্মুখীন হতো। তখন মুদ্রা প্রচলন পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং সম্রাট সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ২০০ টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের একটি উন্নত মুদ্রাপদ্ধতি দেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও জনগণের কাছে তা অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। এই বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি।[৩৪] এখানে শুধু একথা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, এ মুদ্রাপদ্ধতি কেবল ব্যবসায়ী ও বণিকশ্রেণীর জন্য অন্তহীন বিড়ম্বনাকর পদ্ধতি ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের জন্যও তা বিরক্তিকর ছিল। জেমস্ টেলরের মতে, ১৭৮৯ সনে ঢাকায় ১৬টি সংখ্যার মুদ্রার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে ১০টি অরকট টাকার, তিনটি সিককা টাকার এবং তিনটি সানওয়াট টাকার মুদ্রা ছিল।[৩৫] ঢাকাস্থ ইংলিশ ফেক্টরি রেকর্ডস-এ সকল প্রকার লেনদেনের জন্য দশ মাসা রুপি এবং সিককা রুপির পুনঃপুন উল্লেখ পাওয়া যায়। দশমাসা রুপি অবশ্যই এক শ্রেণীর অরকট রুপির নাম। মুদ্রাপদ্ধতির বিরক্তিকর দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য আমি ১৭৭২ সালে প্রদত্ত জেমস্ স্টুয়ার্ডের বক্তব্য করছি :

There are various mints established by ancient by custom, where the regulations both as to the fineness and the weight of coins are different, thought their denomination be the same from this and from punching out holes and filling up these holes with base metals, as well as willfully diminishing the weight of the coins, after coining from the mint, the currencies of rupees of different provinces are of different values...When a sum of rupees is brought to a shroff, he examines them piece by piece, ranges them according to their fineness, then by their weight. Then he allows for the different legal battas upon siccas and sanats (sanwats) ; and this done, he values it gross by the rupee current, what the whole quantity is worth... No person can tell the value of the coin he is possesed of untill a shroff be consulted upon the matter.[৩৬]

টীকা

১. *Travels of Fray Sebastion Manrique,* ভল্যুম-১, পৃ. ৪৪-৪৫।

২. *Proceedings of the Board of Revenue,* ৮ই জুন ১৭৮৭, সংখ্যা-১৩, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম-৭, খণ্ড-২, পৃ. ৩৪০।

www.nagorikpathagar.org

৩. তুলনীয়, *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী,* এ রোজার্স অনূদিত এবং এইচ. বেভারেজ সম্পাদিত, পৃ.: ৭৮।
৪. পূর্বের পৃষ্ঠা দেখুন।
৫. তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।
৬. *Travels of Fray Sebastian Manrique,* ভল্যুম-১, পৃ. ৪২-৪৫।
৭. *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca,* পৃ. ৩৭-৩৮।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
১০. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২, *Consultations,* ১লা ডিসেম্বর, ১৮৪৩ এবং ভল্যুম-৩, *Consultations,* ১২ই নভেম্বর, ১৭৫০।
১১. *The Diaries of Streynsham Master,* ভল্যুম-১, পৃ. ৩২, ৫৫, ৩২৭ টি ৪৯৩।
১২. *Fifth Report,* ভল্যুম-২, পৃ. ২০১।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।
১৪. পরিশিষ্ট-৩, নং-৬।
১৫. *B.P.C.,* ২৫শে মার্চ, ১৭২৩।
১৬. *Dacca Factory Records,* ভল্যুম-২।
১৭. প্রাগুক্ত, যেখানে ঢাকা ফেক্টরির সামরিক সংস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।
১৮. তুলনীয়, প্রাগুক্ত, ১৭৩৭ সনের অক্টোবর মাসের নগদ হিসাব এবং ১৭৩৯ সনের জানুয়ারি মাসের নগদ হিসাব।
২০. পরিশিষ্ট-৩ দেখুন।
২১. *Report on the Office of Kanunga,* জে ডি. পেটারসন প্রণীত, আর.বি. রামস বোথাম কর্তৃক *Studies in the Land Revenue History of Bengal* এ প্রকাশিত।
২২. পরিশিষ্ট-৩-এ মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাব দেখুন।
২৩. *Journal of the Asiatic of Pakistan,* ভল্যুম-৭, নং-২, ১৯৬২, পৃ. ৩২৬-৩২৭।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-৩২২।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. তুলনীয়, *Proceedings of the Dacca Provincial Council,* ২৪শে জুলাই, ১৭৭৫, ঢাকা ফেক্টরি রেকর্ড, ভল্যুম-১০-এ প্রকাশিত।
২৮. তুলনীয়, *Aurangzib's Farman,* জে. এন. সরকার অনূদিত এবং সম্পাদিত, *Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1906*-এ প্রকাশিত।
২৯. তুলনীয়, পরিশিষ্ট-৩, মুহাম্মদ রেজা খানের হিসাব।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. সেই হিসেবে বর্ণিত আছে যে, ঔষধ মুর্শিদাবাদে সরবরাহ করা হয়েছিল। কিন্তু অনুমিত হয় যে, কপিকারক ভুলক্রমে ঢাকার স্থলে মুর্শিদাবাদ লিখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

৩২. *Topography,* পৃ. ২৭৩–২৭৪।

৩৩. *The Diary of William Hedges,* ভল্যুম-১, পৃ. ৪৪।

৩৪. আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His Times,* পৃ. ৯৩–৯৭।

৩৫. *A Description and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca,* পৃ. ১৫২। এসকল মুদ্রায় ভিন্নতার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *Murshid Quli Khan and His Times,* পৃ. ৯৩–৯৭ ; জেমস্ স্টুয়ার্ট, *Principles of Money applied to the present state of the coin in Bangal,* পৃ. ১৬।

৩৬. জেমস্ স্টুয়ার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭–২৪।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট-১

ঢাকার হাট, বাজার ও গঞ্জসমূহ থেকে গৃহীত অর্থের হিসাব

হাট-বাজার ও গঞ্জের নাম	মালিকের নাম	গঞ্জের সংখ্যা	জমার বিবরণ		
			কোম্পানির দিউ-য়ানি গ্রহণের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার ও গঞ্জ হতে সংগৃহীত আয়ের মোট পরিমাণ	কোম্পানি দিউয়ানি গ্রহণের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার ও গঞ্জ হতে সংগৃহীত আয়ের মোট পরিমাণ	মোট আদায়ের পরিমাণ
১. বাজারকর তলব খান (আধুনিক ঢাকার বেগম বাজার)	লালী বেগম (লাইলী বেগম)	১	১৫৪-১-৮-২	-	১৫৮-১-৮-২
২. নারায়ণগঞ্জ	লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর	১	৬৪৪৭-১০-১-০	-	৬৪৪৭-১০-১-০
৩. লক্ষ্মীবাজার	ছোটন দাস	১	১২৪-৩-২-৩	-	১২৪-৩-২-৩
৪. বাজার রূপসী	জয়গোবিন্দ সেন	১	৩০-১০-১২-২	-	৩০-১০-১২-২
৫. হাট সোয়াপুর	রাম রতন	১	৩-১৪-৩-০	-	৩-১৪-৩-০
৬. বাজার কোয়ালী পাড়া	গঞ্জ ধর	১	৬৩-০-৬-১	-	৬৩-০-৬-১
৭. বাজার বোরনা	রামগোবিন্দ বসু	১	২৮-৫-৩-১	-	২৮-৫-৩-১
৮. হাট মোট বাড়ী	কাশীরাম দাস	১	৩৫-১-২-১	-	৩৫-১-২-১
৯. কেরানীগঞ্জ	পিলিপ শেঠ[৩]	১	৫২১-১০-৮-৩	-	৫২১-১০-৮-৩
১০. বাজারধানচলা	রামপ্রসাদ	১	৫-৯-৮-০	-	৫-৯-৮-০
১১. গোবিন্দগঞ্জ	ভৌকোন লাল	১	৩০৮-৮-১৯-১	-	৩০৮-৮-১৯-১
১২. রহমত গঞ্জ	নবাব ইব্রাহীমখান[৪]	১	৫৫-১৩-১৫-২	-	৫৫-১৩-১৫-২
১৩. বুরানগঞ্জ	নবাব নসরতজঙ্গ[৫]	১	১৭৭-১০-৪-২	-	১৭৭-১০-৪-২
১৪. ইমামগঞ্জ	ঐ	১	-	৯১-১১-১৬-০	৯১-১১-১৬-০
১৫. বাজার রায় হরিরাম মল্লিক	হরিরাম	১	-	৬২-৫-১৫-০	৬২-৫-১৫-০
১৬. কুলীগঞ্জ	নরনারায়ণ ঘোষ	১	-	৫৭৬-৯-৪-২	৫৭৬-৯-৪-২
	মোট	১৬	৭৯৬০-৬-১০-২	৭৩০-১০-১-২	৮৬৯১-১১-১৭-০
				প্রকৃত যোগফল হবে	৮৬৯১-০-১১-৪

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্টে বর্ণিত স্থানসমূহের পরিচিতি

উল্লিখিত আদায়ের মধ্যে দোকানভাড়া যোগ করা হয়নি। (দেখুন ১৭৯২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত কালেক্টরের পত্র, *Bengal Board of Revenue Miscellaneous Proccedings,* রেঞ্জ–৮৯, ভল্যুম–৩৮, প্রসিডিংস, ৭ই মার্চ (১৭৯২)। এসকল হাট–বাজারের মধ্যে ১,৩,১১ হতে ১৫ নং হাট–বাজার একই নামে আজও বর্তমান আছে এবং তা ঢাকা শহরে অবস্থিত। ১১ নং গঞ্জ গোবিন্দগঞ্জ হচ্ছে আধুনিক দয়াগঞ্জ এবং বোরহানগঞ্জ মিটফোর্ট এলাকার নিকট অবস্থিত। ১৫ নং বাজার সম্ভবত শহরের মাঝখানে অবস্থিত আধুনিক রায় সাহেব বাজার।

এসকল বাজারের কিছু বিস্তারিত বিবরণ

বুরানগঞ্জ : এই গঞ্জের মালিক ঢাকার নবাব নসরত জং। তাঁর চাচা (প্রকৃতপক্ষে মাতামহ) জেসারত খান তা প্রতিষ্ঠা করেন। জেসারত খানের এক পুত্র ছিলেন বোরহান উদ্দিন খান এবং তিনি ঐ স্থানে সমাহিত আছেন। এই গঞ্জ থেকে যে আয় হতো তা তাঁর সমাধি মেরামত ও অন্যান্য খাতে খরচ হতো। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য থেকে সহজে ধারণা করা যায় যে, গঞ্জটি ১১৬৮ বাংলা সনে (১৭৬১–৬২ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমামগঞ্জ : এ গঞ্জটিও ঢাকার নবাবের মালিকানাধীন। কিন্তু আমি এটা অগ্রাহ্য করি। কারণ এটি কোম্পানির দিউয়ানির লাভের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি এ মন্তব্য করা অতি প্রয়োজন মনে করি যে, নবাব ঘোষণা করেছেন যে, উল্লিখিত গঞ্জ থেকে যে লাভ হয় তা বিভিন্ন কাজে খরচ করা হয়ে থাকে।

বাজার করতলব খান : কোম্পানির দিউয়ানি লাভের বহু আগে এই বাজারটি নবাব জাফর খান (যিনি মুর্শিদকুলী খান নামে সাধারণত পরিচিত) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাজার হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যয় করা হতো।

নারায়ণগঞ্জ : জনৈক বেনুর ঠাকুর এই গঞ্জের মালিক। প্রাপ্ত সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১১৭০ বাংলা সনে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১১৭৩ বাংলা সনে বর্তমান রাজার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি নবাব মুজাফফর জঙ্গ (অর্থাৎ মুহাম্মদ রেজা খান) হতে এ গঞ্জের জন্য সনদ লাভ করেন। বর্তমান রাজার রাজত্বের দশম বর্ষে এবং ২৮শে মহরম (হিজরি বর্ষের প্রথম মাস) এই গঞ্জের দখলস্বত্বের উপর কোম্পানির সীলমোহরযুক্ত একটি সনদ তিনি লাভ করেন। এই গঞ্জ হতে অর্জিত সকল লাভ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন এবং এক দল ভিক্ষুকের লালনের জন্য ব্যয় করা হয়।

বাজার লাকীগঞ্জ : এই গঞ্জের মালিকও উল্লিখিত গঞ্জের মালিক (বেনুর ঠাকুর) এবং তাঁর স্বত্বও উপযুক্ত গঞ্জের অনুরূপ।

বাজার রায় হরিরাম মল্লিক : গ্রুবার চীপ থাকাকালীন সময়ে ১১৭৯ বাংলা সনে রায় হরি মল্লিক (কোম্পানি শাসনের সূচনালগ্নে তিনি ঢাকা কালেক্টরেটের দিউয়ান ছিলেন) এ বাজার

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং দুইজন বিধবা স্ত্রী রেখে যান, যাঁরা তাদের জীবনধারণের উপায় হিসেবে এই বাজার থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তাঁরা আমার কাছে তাঁদের দরিদ্র অবস্থার কথা বর্ণনা করে এবং সরকারের সাহায্য লাভের জন্য বিনীত আবেদন জানান।

কুলীগঞ্জ : এই গঞ্জের মালিক এই জেলার কালেক্টর হল্যান্ড থেকে সনদ লাভ করেন...এর উদ্দেশ্য ছিল কিছু ধর্মীয় স্থানের ব্যয় বহন। যেহেতু ১৭৬৫ সনে এই গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু আমি তা বাতিল করি। বোর্ড অবশ্যই এই ব্যক্তিকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে তা নির্ধারণ করবেন।

বাজার জোপসা : এই বাজারের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানির দিউয়ানি লাভের পূর্বেই এই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাজার থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হতো।

হাট সোয়াপুর : উপরে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই হাটের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

বাজার কোয়ালী পাড়া : ঐ

হাট বুরনা : ঐ

বাজার মোটবাড়ি : ঐ

কেরানীগঞ্জ : কোম্পানির দিউয়ানি লাভের আগে ইলিয়ট নামক একজন পর্তুগীজ লেখক এই গঞ্জটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর জনৈক ফিলিফ নীল এটি ক্রয় করেন। অদ্যাবধি এটি তাঁর দখলে আছে।

গোবিন্দগঞ্জ : ১৭৬৫ সনের অনেক আগে দেওয়ান মানিক চাঁদ দীয়াগঞ্জ নামে এই গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র দীয়া চাঁন্দ এর মালিক হন। তিনি সরকারি পাওনা প্রদান করেন। ফ্রান্সিস তা প্রকাশ্য নিলামে দিলে বেকুন ঠাকুর তা ক্রয় করেন।

বাজার ধানচরা : কোম্পানির দিউয়ানির লাভের পূর্বে একজন তালুকদার এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাজার থেকে তাঁর লভ্যাংশ উপাস্য দেবীর জন্য উৎসর্গ করে যান।

রহমতগঞ্জ : এই গঞ্জটি ১০০ বছর আগে নবাব ইব্রাহিম খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

টীকা

১. *Bengal Board of Revenue*–এর নিকট ঢাকার কালেক্টরের পত্র। তারিখ ১লা জুলাই, ১৭৯১। *Bengal Board of Revenue (Miscellaneous) Proceedings,* রেঞ্জ ৮৯, ভল্যুম–৩৭, ১৭৯১ সনের ৭ই ডিসেম্বরের প্রসিডিংস–এর সাথে সংযুক্ত।

২. এটি বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক নির্মিত, যিনি ১৭২৭ সনে মারা যান, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* ভল্যুম–৭, নং–২, ১৯৬২ পৃ. ৩০০।

www.nagorikpathagar.org

৩. ফিলিপকে শেঠ উপাধি প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্ভবত তিনি ব্যাংক ব্যবসা করতেন।

৪. ১৬৮৯ থেকে ১৬৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে তাঁর কোনো অধস্তন পুরুষ এই বাজারের মালিকানা লাভ করেন।

৫. ১৭৮৮ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত ঢাকার নায়িব-নাযিম ছিলেন।

৬. বোর্ড অব রেভেনিও-এর নিকট ঢাকার কালেক্টরের পত্র, ১৬ই মে, ১৭৯১, *Bengal Revenue Consultation,* রেঞ্জ-৮৯, ভল্যুম-১৪, *consultations* তারিখ ২৩ শে ডিসেম্বর ১৭৯১।

৭. মূল রেকর্ডে জায়গাটুকু খালি ছিল।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

ক. ফরাসি ও উর্দু গ্রন্থ

আইন-ই-আকবরী	:	আবুল ফজল রচিত ২য় খণ্ড, এইচ.এস. জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং জে.এন. সরকার কর্তৃক সংশোধিত, কলিকাতা, ১৯৪৯।
আকবরনামা	:	আবুল ফজল রচিত তৃতীয় খণ্ড, এইচ. বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত, ১৯০২।
আসুদগান-ই-ঢাকা (উর্দু)	:	হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত, ঢাকা।
বাহরিস্তান-ই-গায়বী	:	মির্জা নাথন রচিত, এম.আই., বোরাহ অনূদিত, আসাম সরকার, ১৯৩৬।
মাসির-উল-উমারা	:	শাহনওয়াজ খান এবং অন্যান্য রচিত, বেনী প্রসাদ এবং এইচ, বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা ১৯১১, ১৯৫২, ১৯৩৬।
মিরাত-ই-আহমদী	:	আলী মুহাম্মদ খান রচিত, বরোদা ১৯২৭-৩০।
রিয়াজ-উস-সালাতীন	:	গোলাম হোসেন সলীম রচিত, আবদুস সালাম অনূদিত, কলিকাতা, ১৯০৪।
সিয়ার-উস-মুতাখ্খেরীন	:	সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ী রচিত, হাজী মোস্তফা অনূদিত, কলিকাতা ১৯২৬।
তারীখ-ই-ঢাকা (উর্দু)	:	রহমান আলী তায়েশ রচিত, ঢাকা।
তারীখ-ই-নসরতজঙ্গী	:	নওয়াব নসরতজঙ্গ রচিত, হরিনাথ দে সম্পাদিত *Memories of the Asiatic Society of Bengal,* ভল্যুম-২, নং-৬।
তওয়ারীখ-ই-বাঙ্গালা	:	সলিমুল্লাহ রচিত, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, পাণ্ডুলিপি নং ২৯৯৫

খ. লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রেকর্ডপত্র

Bengal Revenue Consultations, রেঞ্জ-৮৯, ভল্যুম-১৩।

Bengal Board of Revenue (Miscellaneous Proceedings), রেঞ্জ- ৮৯, ভল্যুম-৩৬, রেঞ্জ-৯৫, ভল্যুম-১৫।

www.nagorikpathagar.org

বোর্ডস কালেকশান নং ১০০১২।

Dacca Factory Records, ভল্যুম ১-৬।

Diaries and Consultations of the English Council in Calcutta (Bengal public Consultations), ভল্যুম ১-৮।

Home Miscellaneous Series, ভল্যুম- ৪৭, ৪৫৬ এফ, ৬৩০

প্রসিডিংস, ঢাকা প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল, ভল্যুম ১-৩।

secret Consultations, রেঞ্জ এ ভল্যুম-৬।

গ. প্রকাশিত দলিলদস্তাবেজ

Ascoli, F.D. — *Final Report of the Survey and Settlement of Dacca.*

Fawcett.C. (ed) — *The English Factories in India.* New Series 1670-1677. 2 vols, Oxford, 1936, 1932.

Firminger, W.K. (ed) — *The fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company,* 1812, 3 Vols. Calcutta, 1917.

Hedges, W. — *The Diary of William Hedges, ed.* by H. Yule, London, 1887-89.

Hill, S.C. — *Three Frenchmen in Bengal,* Longman & Green Co. 1903.

Bengal in 1756-57, London, 1905.

Hunter W.W. — *A Statistical Account of Bengal,* Vol. V, London, 1875.

Master, Streynsham — *The Diaries of Streynsham Master,* ed. by R.C. Temple, London, 1911.

Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division, (Report of A.L. Clay, Officiating Collector and Magistrate of Dacca, Dated 16th July 1867) Culcutta : 1868.'

Proceedings of the Committee of Circuit, Vol. IV Dacca, Bengal Government Publication.

Wilson, C.R.: *Early Annals of the English in Bengal,* Calcutta : 1895-1917.

www.nagorikpathagar.org

পরিব্রাজকগণ বিবরণ

Bernier, F.	*Travels in Mughal Empire,* Westminister, 1891.
Bowrey, Thomas	*The Countries round the Bay of Bengal, Conbridge, 1905.*
Heber, Bishop	*Narrative of A Journey through the Upper Provinces of India,* London, 1828.
Foster, W. (ed)	*Early Travels in India,* Oxford, 1921.
Manrique, S.	*Travels of Fray Sebastian Manrique,* Hakluyt Society, London, 1926.
Manucci N.	*Storia Do Mogor,* W. Irvine অনূদিত, London, 1906-1908.
Taverier, J.B.	*Travels in India,* London, 1889.

অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থাবলি

Ahmed Shamsuddin :	*Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, Rajshahi, 1960.
Ascoli, F.D.	*Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report,* Oxford, 1917.
Bhattacharya, S.N.	*Mughal North-Eastern Frontier Policy.*
Bhattacharya, S.	*East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740,* London, 1954.
Bradley-Birt	*Romance an Eastern Capital,* London, 1906.
Compos, J.J.A.	*History of the protuguese in Bengal,* Calcutta & London, 1919.
Colebrooke & Lambert :	*Remarks on the present state and Husbandry of Bengal,* Calcutta, 1795.
Dani, A.H.	*Dacca,* 2nd edition, Dacca, 1962.
Datta, K.K.	*Alivardi and His Times,* Calcutta, 1939.
Dow, A.	*The History of Hisdostan,* vol. III, London, 1812.
D'Oyly, C,	*Antiquities of Dacca,* London, 1824-30.
Gladwin, F.	*A Narrative of the Transactions in Bengal, during the Sobahdaries of Azeem-us-Shan,*

www.nagorikpathagar.org

	Jafar Khan, Shuja Khan, Sarfaraz Khan and Alivardi khan, London, 1788.
Grant, James	*Analysis of the Finances of Bengal,* Published in Fifth Report, vol. II. Calcutta, 1917.
Gupta, N.K.	
Hasan, Sayid Aulad	*Notes on the Antiquities of Dacca,* Dacca, 1912.
Irvine, W.	*Later Mughals,* Calcutta and London, 1922.
Karim, A.	*Murshid Quli Khan and His Times,* Dacca, 1963.
Majumdar, H.N.	*The Reminiscence of Dacca,* Calcutta, 1926.
Majumdar, R.C. (ed)	*History of Bengal,* vol. I, Dacca University, 1943.
Moreland, W.H.	*Agrarian System of Moslem India,* Cambridge, 1929.
Orme, Robert	*Historical Fragments of the Mughal Empire,* London, 1805.
Qurshi, I. H.	*Administration of the Sultanate of Delhi,* Lohore, 1944.
Ramsbotham, R.B.	*Studies in the Land Revenue History of Bengal, 1769-1787,* Oxford, 1926.
Rennell, J.	*A Bengal Atlas,* London, 1780.
Ray, J.M.	*ঢাকার ইতিহাস,* Calcutta, 1319-22, B.S.
Ray Chowdhuri T.K.	*Bengal under Akbar and Jahangir,* Calcutta, 1953.
Saran. P.	*Provincial Government of the Mughals,* Allahabad, 1941.
Sarkar, Sir J.N.	*Studies in Mughal India,* Calcutta, 1919.
	Mughal Administration, 2nd edition, Calcutta, 1924.
(ed)	*History of Bengal,* Vol. II. Dacca University, 1948.

www.nagorikpathagar.org

	Bengal Nawabs, Calcutta, 1952.
Sarkar, Jagadish Narrayan	*Mir Jumla.*
Sinha, J.C.	*Economic Annals of Bengal,* London, 1927.
Steuart, James	*Principle of Money Applied to the Present State of the Coin in Bengal,* London, 1772.
Stewart, Charles	*History of Bengal,* Calcutta, 1910.
Taifoor, S.M.	*Glimpses of Old Dhaka,* Dacca, 1952.
Taylor, James	*A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Calcutta, 1840.*
	A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca, London, 1851.
Wise, James	*Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* London, 1883.
Wright, H.N.	*Catalogue of the Coins in the Indian Museum,* Calcutta, vol. III.

জার্নাল

Bengal: Past and Present, Calcutta.

Bharatiya Vidya.

Dacca Review, Dacca.

Dacca University Studies, Decca.

Islamic Culture, Hyderabad, Deccan.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Dacca.

www.nagorikpathagar.org